অবলুপ্ত প্রাকৃত-এর সন্ধানে

ত্রিদিব সেনগুপ্ত

দুহাজার-এর মে মাসে অনুষ্টুপ প্রকাশন থেকে আমাদের বই 'মার্জিন অফ মার্জিন : প্রোফাইল অফ অ্যান আনরিপেন্টান্ট পোস্টকলোনিয়াল কোলাবোরেটর' প্রকাশিত হয়। আটানববই থেকে অপর অনুষ্টুপ এবং অন্যস্বর পত্রিকায় এই সংক্রান্ত বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা চলছে। সেই প্রবন্ধগুলোর কিছু রেফারেন্স আসবে এই লেখায়, এই অর্থে যে যদি কোনো প্রসঙ্গ অন্যান্য প্রবন্ধগুলোয় আগেই খুব বিশদে এসে থাকে তো সেই বিষয়টা সামান্য ছুঁয়েই চলে যাব। আমি ধরে নিচ্ছি অপরের পাঠকের গত বইমেলার অপরের লেখাটা (মার্জিন অফ মার্জিন : একটা অটেকনিকাল ভূমিকা) পড়া আছে। খুব ভালো হয় যদি সঙ্গে এই বইমেলার অনুষ্টুপের লেখাটা পড়া থাকে (কলোনি যায়নি মরে আজো) ।

কোথায় গেল আমাদের চিরকালের চেনা শ্রমিক শ্রেণী? বা ধরুন আর একটু ভিন্ন আকারে, সাবঅল্টার্ন? বা আমাদের 'জিনা ইয়াহাঁ মরনা ইয়াহাঁ, ইসকে সিওয়ায়ে জানা কাহাঁ' তৃতীয় বিশ্ব? বেচারা থার্ড ওয়ার্ল্ড? ঝালে ঝোলে অম্বলে কম্বলে আমাদের সর্বঘটের কাঁঠালি কলা, হায় বেচারা তৃতীয় বিশ্ব, যার দোহাই না-পেড়ে আমাদের কোনো সেমিনার কোনো মিটিং কোনো বনগাঁ লোকাল বক্তব্য অব্দি কেমন আলুনি লাগত, সে কিন্তু আকস্মিকভাবেই হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেছে — জানিনা আপনারা সবাই সেটা খেয়াল করেছেন কিনা। আমরা উত্তরআধুনিক এবং উত্তরঔপনিবেশিককে যে তাত্ত্বিক তলে যেভাবে চিনে অভ্যস্ত সেখানে প্রাকৃত বা সাবঅল্টার্ন আর নেই, অন্তত তার পুরোনো অর্থে আর নেই। দার্শনিক বর্গ হিশেবে তার বাস্তবতাটাই চুরি গেছে, অস্তিত্বটা নেই হয়ে গেছে। আসুন আমরা দুমিনিট নিরবতা পালন করি, তারপর সেই অবলুপ্ত প্রাকৃতের খোঁজে একটু এদিক ওদিক হাতড়াই, একটু হেগেল একটু লাকলাউ মুফে, একটু ফুকো একটু ইত্যাদি। দেখি — আমাদের সঙ্কর শাসন বা সিন্থেটিক হেজেমনির ধারণা এই অবলুপ্ত প্রাকৃতকে কোনো পুনর্বাসন দিতে পারে কিনা। প্রাকৃত, প্রাকৃতের প্রতিরোধ, সেই প্রতিরোধের প্রক্রিয়ায় ভালো মন্দ ধর্ম অধর্ম কাঙ্খিত অকাঙ্খিত-র মূল্যবোধ।

উত্তরআধুনিকতা আমাদের দেখিয়েছে, কোথাও কোনো স্পষ্ট নিখুঁত সংজ্ঞা আর নেই। তাই স্পষ্ট বৈপরীত্য নেই। স্পষ্ট মেরুকরণ নেই। দেখিয়েছে কিভাবে যে কোনো স্পষ্ট এবং নিখুঁত সংজ্ঞার পিছনে কাজ করে একটা এসেনশিয়ালিস্ট চিন্তন-কাঠামো। মানে এসেন্স, যা নিয়ন্ত্রণ করে গোটা কাঠামোটাকে। এবং একেশ্বর যে কোনো এসেন্স ভুল হতে বাধ্য। বাস্তবতা যে কোনো জটিল চিন্তার চেয়েও বহুগুণ বেশি জটিল, কারণ, বাস্তবতা সম্পর্কে জটিলতম চিন্তাও ওই বাস্তবতারই অংশ, আর সমগ্র তো কখনো তার অংশের চেয়ে কম জটিল হতে পারেনা। তাই বাস্তবতা সম্পর্কে জটিলতম চিন্তার চেয়েও, জটিলতম চিন্তার চেয়েও বাস্তবতা জটিল হতে বাধ্য। অতয়েব, যে কোনো এসেন্স, তা যত জটিল ভাবে নির্মিতই হোক না কেন, একটা জায়গায় গিয়ে বাস্তবতার তুলনায় অনেক কম কথা বলবে, বাস্তবতার নামে বাস্তবতার চেয়ে অনেক কম জটিল অনেক কম কথা বলবে। মানে, ভুল কথা বলবে। কিন্তু যেহেতু সেটা এসেন্স তাই বাস্তবতা সম্পর্কিত ওই তত্ত্বের যে কোনো অংশের উপর নিজেকে চাপিয়ে দেবে। ভুল রকমে, ফ্যাসিস্ট রকমে। এসেন্সের এই ফ্যাসিজমের, মানে এসেনশিয়ালিজমের বাইরে এসে প্রথম আমাদের কথা বলার একটা জায়গা করে দিয়েছিল উত্তরআধুনিকতা।

চারদিকের বাস্তবতা নিয়তই বদলে যাচ্ছিল। পুরোনো প্রদত্ত বর্গগুলোর প্রত্যেকে নিয়ত বদলাচ্ছিল, বদলাতে বদলাতে সাদা আর কালো, ভালো আর মন্দ সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। এই তালগোল পাকানো উত্তরআধুনিক বাস্তবতার তত্ত্বই পোস্টমডার্নিজম বা উত্তরআধুনিকতা। আধুনিকতা এসেছিল তার নবজাগরণ মানে এনলাইটেনমেন্ট নিয়ে। এনলাইটেনমেন্ট মানে যুক্তির শাসন। রিজন উইথ এ ক্যাপিটাল আর। আধুনিকতার ঈশ্বর। কিন্তু যুক্তি বা লজিক কাজ করতে গেলে নিখুঁত স্পষ্ট বর্গ দরকার পড়ে,

বর্গগুলোর স্পষ্ট সম্পর্ক দরকার পড়ে। উত্তরআধুনিকতার হাতে এই লজিক আক্রান্ত হল। আর লজিক মোতাবেক রিজন মোতাবেক গড়ে উঠেছে আমাদের বাস্তবতা সম্পর্কে যাবতীয় তত্ত্ব। বাস্তবতার অন্তর্বর্তী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের তত্ত্বগুলোও। তাই রিজন যদি ভেঙে পড়ে তো সেগুলোও ভেঙে পড়ে বৈকি।

স্পষ্ট বর্গ নেই, স্পষ্ট মেরু নেই। তার মানে শ্রমিক আর মালিক এই দুই মেরুতে বিন্যস্ত বাস্তবতার তত্ত্বগুলোও ভেঙে পড়ল। এখন তো শ্রমিক আর মালিক দুই-ই অস্পষ্ট। আবছা। এর পরে এল উত্তরঔপনিবেশিকতার তত্ত্ব। যা আমাদের বোঝাতে চাইল, যখন আমরা কলোনি ছিলাম তখন ওইসব যাবতীয় কলোনাইজার-কলোনাইজড অসাম্য ছিল বৈকি। কিন্তু ওসব খারাপ জিনিষ এখন আর নেই। এখন আর কেউ কারুর বড় বা ছোট নই। আমরা সবাই সমান।

কিন্তু আমাদের তৃতীয় বিশ্বের অভিজ্ঞতা তো তা বলেনা। ভারত আর আমেরিকা সমান? আপনার পাড়ার যেকোনো ছাত্রকে জিগেশ করে দেখুন তার স্বপ্ন কী? আমরা জানি কলোনির অবয়বে না হোক অন্য আর এক রকমে আর এক রকম কলোনি এখনো চলছে। নামহীন কলোনি। আগে আঙুল তুলে দেখানো যেত — ওই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমার সব সম্পদ শুষে নিয়ে গেল। এখন আর দেখানো যায় না কে সেই শোষণটা করছে, গোটা প্রক্রিয়াটা নামহীন হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতের উদ্বৃত্ত, তৃতীয় বিশ্বের উদ্বৃত্ত আজো পাচার হয়ে যায় প্রথম বিশ্বের দেশে দেশে। অন্যত্র আমরা সেই জটিলতা নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু এই প্রবন্ধে আমরা তত্ত্বের জগতে তৃতীয় বিশ্বের চুরি হয়ে যাওয়া বাস্তবতাটা নিয়ে কথা বলতে চাই। এমন একটা তাত্ত্বিক কাঠামো খুঁজতে চাই যা দিয়ে এই উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক তত্ত্বের জগতেও তৃতীয় বিশ্বের সাবঅল্টার্নের, প্রাকৃতের কথা বলা যায়। তার বেদনার কথা বলা যায়, তার উপরে ঘটে চলা ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণের কথা বলা যায়।

উত্তরআধুনিকতা, বিশেষতঃ উত্তরঔপনিবেশিকতার তত্ত্ব তার উত্তরআধুনিক অবয়বে এসে তৃতীয় বিশ্বের খেটে খাওয়া মানুষের নিপীড়নের বাস্তবতাটাকেই হাওয়া করে দিয়েছে। এসেন্স না থাকায় এসেন্স থেকে বিচ্যুতি বলেও কিছু নেই। তাই আমাদের পরিচিত পুরোনো বর্গগুলো — শোষণ, অত্যাচার, দমন, নিয়ন্ত্রণ, বশীকরণ, হেজেমনি — এই সমস্ত পুরোনো ধারণাগুলোই এক অর্থে অকেজো হয়ে গেছে। উত্তরআধুনিকতার এই তত্ত্বে ভালো খারাপ কুৎসিত বলে আর কিছু নেই, সবই পার্থক্য, ডিফারেন্স। কারণ, ভালোকে ভালো বলে বুঝতে গেলেও তো একটা এসেনশিয়াল ভালোত্বের ধারণা লাগবে।

গত ৯৮ থেকে অনুষ্টুপ অপর অন্যস্বর পত্রিকায় লেখা এই প্রবন্ধের সিরিজে এবং ২০০০-এ প্রকাশিত আমাদের বই 'মার্জিন অফ মার্জিন : প্রোফাইল অফ অ্যান আনরিপেন্টান্ট পোস্টকলোনিয়াল কোলাবোরেটর'-এ আমরা তৃতীয় বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের এই বেহাত হয়ে যাওয়া বাস্তবতাকে উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক তত্ত্বের জগত থেকে পুনরাহরণ করার চেষ্টা করছি। এবং তার মানে কখনোই এই নয় যে আমরা উত্তরআধুনিকতা থেকে সরে আসছি। কারণ, আমরা সেটা পছন্দ করি আর না করি, আমাদের বাস্তবতা উত্তরআধুনিক হয়ে গেছে। এই লেখাগুলোয় আমরা এমন একটা উত্তরআধুনিক ভূমি নির্মাণের চেষ্টা করেছি যে ভূমির গর্ভে একটা ক্ষুদ্রতর জায়গাকে সাবস্পেসকে দেগে দেওয়া যায়। এমন সাবস্পেস যা অত্যাচারের নিপীড়নের গতিবিজ্ঞানগুলোকে ধারণ করতে পারবে। আমাদের 'সিন্থেটিক স্পেস' বা সঙ্কর ভূমি সেইরকম একটা ভূমি। হোমি ভাভা বা তার অনুসারীদের থার্ড স্পেস থেকে আমাদের এই সিন্থেটিক স্পেস আলাদা। ক্ষমতার সেই ফল্গু যাকে থার্ড স্পেস গোপন করে, লুকিয়ে ফেলে তার তত্ত্বের গভীরে, আমাদের সিন্থেটিক স্পেস তাকে স্পষ্ট উচ্চারণ করে, আন্ডারলাইন করে দেয়। ক্ষমতার গোপন প্রবাহের এই অন্তঃসলিলার অন্য নাম 'মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন' বা অতিনিয়ন্ত্রণের অভিনয়।

সিন্থেটিক স্পেসকে তার তাত্ত্বিক জটিলতাগুলোকে নিয়ে আমরা অন্যত্র খুবই বিশদ আলোচনা করেছি। একাধিকবার। এই প্রবন্ধে আমরা শুরু করব হেগেল থেকে। প্রথমে হেগেলের ইতিহাসের গতি এবং হেগেলের ডকট্রিন অফ বিয়িং-কে বুঝব আমরা, যাতে ডিটারমিনেট বিয়িং-কে বুঝতে পারি। সেই ডিটারমিনেট বিয়িং-দের বাস্তবতা দিয়ে এবার আমরা ক্ষমতার, পাওয়ারের গতিকে বুঝব। এই ডিটারমিনেট

বিয়িং আর আদত অর্থে হেগেলের ডিটারমিনেট বিয়িং থাকবে না, হয়ে দাঁড়াবে আমাদের ডিটারমিনেট বিয়িং। আমরা তাত্ত্বিক কাঠামোটাকে আমাদের প্রয়োজন অনুসারে বাঁকিয়ে চুরিয়ে নেব যাতে সেখানে রেজনিক-উল্ফ-এর স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম-এর ধারণাকে নিয়ে আসতে পারি। এই স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম-এর ধারণাকে আমরা ব্যবহার করব আজকের উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক তত্ত্বের ডিসকার্সিভ ভূমিগুলোর উপর। সেই কাজে আমাদের সাহায্য করবে লাকলাউ মুফের হেজেমনিক ফর্মেশনের তত্ত্ব। আমরা দেখাব ক্ষমতার যে নিয়ন্ত্রণকে, পাওয়ারের যে হেজেমনিকে আমরা দেখাতে চাইছি তা এই ভূমিগুলোকে দিয়ে সম্ভব না, যা আমাদের সিন্থেটিক স্পেস-এ সম্ভব। তারপর আমরা ফুকো বা কান্ট থেকে সরে এসে নিটশের জিনিলজি অফ মরালস দিয়ে অন্য রকম একটা প্রতিরোধের তত্ত্বের আবাহন করে আমাদের প্রবন্ধ শেষ করব।

১।। দুই উত্তরের সাঁড়াশি আক্রমণ

উত্তরআধুনিকতা বা পোস্টমডার্নিজম আর উত্তরঔপনিবেশিকতা বা পোস্টকলোনিয়ালিজম — এই দুইই এসেছে উত্তর বা নর্থ থেকে, উন্নত প্রথম বিশ্ব মানে পশ্চিমের রপ্তানি। ওয়েস্ট-এর ডিসকোর্স বা আলোচনা বেয়ে আমাদের কাছে চুঁইয়ে এসেছে এই দুই ধারণা। আজকের তাত্ত্বিক আলোচনার জগতের প্রত্যেকটি বর্গ সম্পর্কেই যা প্রায় একইরকম সত্যি। আমাদের এই এক নম্বর সেকশনটায় আমরা এবার যে কথাগুলো বলব সেগুলো খুবই বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়ে গেছে আগেই অন্যান্য প্রবন্ধে, তাই, যারা সেগুলো পড়েছেন বা যারা উত্তরআধুনিকতা উত্তরউপনিবেশ সংক্রান্ত তাত্ত্বিক অবস্থানগুলো নিয়ে মোটামুটি ওয়াকিবহাল তারা নিশ্চিন্তে এই এক নম্বর সেকশনটা বাদ দিয়ে দু নম্বর সেকশন থেকে পড়তে পারেন। এই সেকশনে আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে এই সম্পর্কে মোদ্দা কিছু কথা বলে নেব।

যে কোনো ক্রম বা হায়েরার্কি ধারণাকেই উত্তরআধুনিকতা আক্রমণ করে। কারণ, এই ক্রম বা হায়েরার্কির মধ্যেই রয়ে যায় একটা এসেনশিয়ালিজম। বা সারবাদ। হেগেলের এসেনশিয়ালিজম বা যে কোনো এসেনশিয়ালিজমেরই কেন্দ্রে থাকে একটা হায়েরার্কি বা ক্রম। ক উপরে খ নিচে, ক কারণ খ কার্য, ক উৎস খ প্রবাহ, ইত্যাদি। মানে একটা একমুখী গতি — ক খ-কে নির্ণয় করছে, খ নির্ণীত হচ্ছে ক-এর দ্বারা। এই হায়েরার্কিতে সবার উপরে রয়েছে এসেন্স। সর্বব্যাপী সর্বত্রগামী সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মত। যে এসেন্স থেকে গজিয়ে উঠছে, প্রবাহিত হচ্ছে আপামর অ্যাপিয়ারেন্স-এর দুনিয়া, বা বস্তুজগত। যেখানে এই বস্তু ওই বস্তু সকল বস্তুই আসলে ওই একেশ্বর এসেন্সের প্রকাশ বা রূপ বা অ্যাপিয়ারেন্স। মার্ক্স-এর তত্ত্বকাঠামোকে যদি আমরা হেগেলের তত্ত্বকাঠামোর সঙ্গে আত্মীয়তার আলোয় পাঠ করার চেষ্টা করি আমরা আবার পাই অনেকটা একই চেহারার একটা হায়েরার্কিকে। শুধু ভাববাদী হেগেল শুরু করেছিলেন বিশুদ্ধ ভাব বা চিন্তা বা আইডিয়া থেকে। এবং সেই ভাব থেকে শুরু করে পৌঁছেছিলেন তার সম্মুখবর্তী বাস্তবতার বস্তুজগতে। কিন্তু বস্তুবাদী মার্ক্স শুরু করলেন ওই বস্তুজগত থেকেই। বাজার সমাজের বস্তুজগত মানে পণ্য সমাহার। মার্ক্স শুরু করলেন বাজারের সেই এই পণ্য ওই পণ্য সমস্ত পণ্য থেকে।

হেগেলের ক্ষেত্রে এসেন্স যে ভূমিকা নিয়েছিল, মার্ক্স-এর কাঠামোয় সেই জায়গা নিল অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার। এই অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবারই আলাদা আলাদা পণ্যের মধ্যে উপস্থিত থাকে আলাদা আলাদা পরিমাণে এবং তাদের মূল্যকে আলাদা আলাদা করে তোলে। মানে, আমাদের সামনে মূর্ত পণ্যেরা হল এই বিমূর্ত শ্রমেরই আলাদা আলাদা রূপারোপ। আমরা আমাদের শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আলাদা আলাদা মাপের মানুষ কারণ আমাদের সম্পত্তির বা সম্পদের পরিমাণ আলাদা আলাদা — অর্থাৎ আমাদের আলাদা আলাদা লোকের মালিকানায় আছে আলাদা আলাদা পরিমাণ বিমূর্ত শ্রম। আমরা কে কতটা সম্মাণের উপযুক্ত তা স্থির করে দেয় আমাদের আয়ের আলাদা আলাদা পরিমাণ, অর্থাৎ, এক একক সময়ে আমাদের উৎপাদিত পণ্যে উপস্থিত আলাদা আলাদা বিমূর্ত শ্রমের পরিমাণ।

আমাদের সমাজে উপস্থিত শাসন এবং শোষণকে মার্ক্স বুঝেছিলেন এই বিমূর্ত শ্রমের নিরিখেই। শ্রমিকের বিমূর্ত শ্রম নিহিত হয়ে বানিয়ে তোলে নতুন পণ্য। এই বিমূর্ত শ্রমই সেই ম্যাজিক যা উদ্বৃত্ত বা সারপ্লাসের

জন্ম দেয়। এবং শ্রমিক শ্রেণীর শ্রম এই উদ্বৃত্ত বানিয়ে তোলার পরেও তারাই এই উদ্বৃত্ত থেকে বঞ্চিত হয়, এবং মালিকশ্রেণী মালিক হওয়ার সুবাদে শ্রমিকশ্রেণীর উৎপাদিত সেই উদ্বৃত্তকে নিয়ে যায়, আত্তীকরণ করে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অর্থনৈতিক এই শোষণের তত্ত্ব নির্মাণ করে মার্ক্স স্বপ্ন দেখালেন একটা শ্রেণীহীন সমাজের। যেখানে শ্রমিকের শ্রমের ম্যাজিকে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত ভোগ করবে গোটা সমাজ, শুধুমাত্র মালিকশ্রেণী নয়, কারণ, মালিকশ্রেণী বলেই আর কিছু থাকবে না। সেই সমাজে আর কোনো শ্রেণীই থাকবেনা।

হেগেলের কাঠামোয় এসেন্স আর অ্যাপিয়ারেন্স, বা মার্ক্স এর কাঠামোয় শ্রমিক আর মালিক, এই দুটো মেরুর মধ্যে বিন্যস্ত বাস্তবতা — বাস্তবতাকে এই দুই মেরুর নিরিখে বোঝার কায়দাটা বেশ প্রাচীন। ভগবান আর শয়তান। ভালো আর মন্দ। পুরুষ আর প্রকৃতি। সাদা আর কালো। ০ আর ১। এই কায়দাটাকে উত্তরআধুনিকরা একটা দ্বিত্ববাদ বা বাইনারিজম বলে ডাকলেন। এবং চীৎকার করে এর বিরোধিতা করলেন। বললেন এটা একটা ফ্যাসিজম। এরকম কিছু হয় না। সব কিছু মিলে মিশে আছে। বিশুদ্ধ সাদা কই, বা বিশুদ্ধ কালো কই? দেখাও তো আমার চারপাশের বাস্তবতায় একপিস বিশুদ্ধ সাদা বা বিশুদ্ধ কালো? সবই তো দোআঁশলা দেশি-বিদেশি-মিক্সড। সবই তো নানা মাত্রার ধূসর। সাদা আর কালো মিলে মিশে আছে সবকিছুতেই, সবকিছুই আছে ধূসর হয়ে। সাদা বা কালো বলে কিছু নেই। যেই সবকিছুকে ধূসর বলে ভাবলাম, অমনি মেরুদুটোর সংজ্ঞাও বদলে গেল। যে ধূসরে কালোকে আর প্রায় চেনাই যাচ্ছে না সেটার চালু নাম সাদা, আর এর উল্টোটার কালো।

কিন্তু সাদা আর কালোকে এইভাবে বোঝা মানেই একটা জায়গায় তাদের আর সাদা বা কালো হিশেবে না-বোঝা। সেই জায়গাটা তাদের বৈপরীত্য। সাদার ঠিক উল্টো মানেই কালো, সাদা মানেই যেখানে কালো অপ্রশ্নিত ভাবে অনুপস্থিত, আবার কালোর ঠিক উল্টো মানেই সাদা — এই বোঝাটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেল। এখন সাদার মধ্যেই কালো মিশে আছে। আর কালোর মধ্যে সাদা। যার টেকনিকাল নাম ওভারডিটারমিনেশন। বা অতিনির্ণয়।

অতিনির্ণয় আসলে একমুখী কার্যকারণ-সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয়। কারণ হল মূল, আর তার থেকে গজিয়ে ওঠে কার্য — এই যে একমুখী কার্যকারণ সম্পর্ক — এটাকেই ঘেঁটে দেয় অতিনির্ণয়। যখন কার্য আর কারণ কেউই আর কারুর বাবাও নয়, বাচ্চাও নয়, বা দুজনেই দুজনের বাবা। দুজনেই দুজনকে একই সঙ্গে নির্মাণ ও নির্ণয় করে। (খেয়াল রাখুন, দুজনেই দুজনের বাবা এর মানেই হল এতদিনকার বাবা-বাচ্চা সংজ্ঞাটাই নষ্ট করে দিলাম আমরা, বাবা মানে তো বাচ্চার বছর তিরিশেক আগে, দুজনেই দুজনের আগে হয় কী করে — ক্রোনলজি বা সময়মুখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমরা পরে এই প্রসঙ্গে আসছি।) এই অতিনির্ণয়ের তত্ত্বটা প্রথম আনেন লুই আলথুসের। তিনি সমাজবাস্তবতাটাকে ভেবে নিলেন একটা কমপ্লেক্স বা জট। যা আবার তৈরি হয়েছে তিনটে জটের অতিনির্ণয়ে। এই তিনটে কমপ্লেক্স হল ইকনমিক পলিটিকাল আর কালচারাল, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক। এর সঙ্গে মার্ক্স-এর কাঠামোর তফাতটা এই জায়গায় যে মার্ক্স-এর তত্ত্বে অর্থনৈতিক নামক জটটাই অন্য সমস্তকিছুকে নির্ণয় করে, একমুখী নির্ণয়। আর এখানে তিনটে জটের প্রত্যেকটাই অন্য প্রত্যেকটাকে অতিনির্ণয় করে। মানে, প্রতিটা অন্য প্রতিটার দ্বারা নির্মিত এবং নির্ণীত হয়। মানে আলাদা করে একটাকে বোঝার আর জো নেই। সবকিছুই অন্য প্রতিটি কিছুর দ্বারা অতিনির্ণীত। (এই পুরোটা নিয়ে অত্যন্ত বিশদ আলোচনা আছে এই সিরিজের অন্য প্রবন্ধগুলোয়, যদি কারুর প্রয়োজন পড়ে তবে লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির সন্দীপ দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, অনেকেই ওখান থেকে সাহায্য পেয়েছেন।) একটা কিছুকে আলাদা করে বোঝার জো নেই, কারণ, একটাকে বুঝতে গেলে অন্য সবকিছুকেই বুঝতে হবে। কিন্তু সবকিছুকে কী করে বুঝব? প্রথমত, তাত্ত্বিকভাবেও সেটা সম্ভব না, কারণ, সবকিছু নামের ওই গতিশীল জিনিষটা সবসময়েই তার নিজের বিষয়ে জটিলতম বোঝার চেয়েও বড় হবে। আর দ্বিতীয়ত, একটা কিছুকে বুঝতে গেলে আরো কিছু, তাকে বুঝতে গেলে আরো আরো কিছু — এই প্রক্রিয়াটাকে একটা জায়গায় তো খুব প্রাক্টিকাল কারণেই থামাতে হবে। এই থামানো-টা হল ক্লোজার, এই প্রবন্ধের শেষ দিকে স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম-এর প্রসঙ্গে আমরা ফের এটায় আসব।

কিন্তু সাদা আর কালো, ভালো আর মন্দ, ভগবান আর শয়তান, মালিক আর শ্রমিক যদি তাদের সত্তার বৈপরীত্যটাই আর টিকিয়ে রাখতে না পারে, প্রত্যেকে অন্য প্রত্যেককে অতিনির্ণয় করে, তাহলে মার্ক্সবাদ মোতাবেক মালিকশ্রেণী আর শ্রমিকশ্রেণীর যে দ্বন্দ্ব আমরা পেয়েছিলাম, শ্রেণীসংগ্রাম এবং সমাজবদলের যে ব্যাকরণ — সেগুলোও তো ঘেঁটে গেল। আর গোলমেলে হয়ে গেল খোদ তৃতীয় বিশ্ব নামক ধারণাটাই। তাহলে এবার এই প্রাকৃতের কী হবে? তৃতীয় বিশ্বের মেহনতী মানুষের যে অবস্থান তাকে যদি সত্তা হিশেবে চিহ্নিতই না করা যায় তাহলে তার অবস্থান থেকে কোনো তাত্ত্বিক কাঠামোই তো আর ঘটে উঠতে পারে না, কোনো বিশেষ মতমতই আর তৈরি হতে পারে না। এই তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা নিয়ে আর দু একটা কথা বলে নেওয়া যাক।

ধরুন যখনই আমরা বললাম দুটো সত্তার মধ্যে আর কোনো নির্দিষ্ট স্পষ্ট চিহ্নিত পার্থক্য থাকতে পারে না, তখনই, হেগেলের সেই এসেন্স আর অ্যাপিয়ারেন্স দিয়ে আমরা আর বুঝতে পারব না, কারণ এসেন্সের মধ্যেই অ্যাপিয়ারেন্স রয়েছে, বা অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যেই এসেন্স। এটা কিন্তু জাস্ট মিশে থাকা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু, মিশে থাকা মানে একটার মধ্যে অন্যটার কিছু অংশ রয়ে যাওয়া। আর এখানে এসেন্স এবং অ্যাপিয়ারেন্স দুজনেই দুজনকে নির্ণয় ও নির্মাণ করছে। এই হেগেলের মডেলে যেমন আর কাজ চলবে না, নিখুঁত ভাবে আর কাজ চলবে না মার্ক্স-এর বিমূর্ত শ্রম দিয়েও, কারণ পণ্যের মূর্ত আর বিমূর্ত, অ্যাবস্ট্রাক্ট আর কংক্রিট তারাও তো দুজনেই দুজনকে অতিনির্ণয় করছে। তাই মার্ক্স তার মডেলে যে অসাম্যকে চিহ্নিত করেছিলেন, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণীশোষণের অসাম্য সেই ধারণাটাও এখন গ্যাঁড়াকল হয়ে গেল। তার সঙ্গে গ্যাঁড়াকল হয়ে গেল এই অসাম্যের বিপরীতে মার্ক্স যে সাম্য ধারণা এনেছিলেন সেটাও।

এর আগে অন্য প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে (অপর, বইমেলা ২০০১) এই সাম্য ধারণাটাই আসলে একটা ফ্যাসিস্ট অবস্থানকে লুকিয়ে রাখে। সাম্যর নামে আর এক রকমের অসাম্য। সাম্য বলে আসলে কিছু হয় না। এই সাম্য ধারণাটার একটা ইতিহাস আছে। সাম্য নামক ধারণাটা এক অর্থে ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে চারিয়ে গেল রাজনৈতিক মতাদর্শের অন্দরে অন্দরে, চিন্তায় চেতনায়, পুঁজি এই সাম্য নামক গাজর দেখিয়েই একের পর এক নতুন নতুন ভূগোলের স্তনাগ্রচূড়ায় নতুন দুধের মানে নতুন মার্কেটের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল ইউরোপের আমেরিকার এশিয়ার আফ্রিকার আচরাচর গাধাদের। গোটা পৃথিবীটাকেই এনে ফেলল একেশ্বর পুঁজির ছত্রছায়ায়। আর তার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীব্যাপী মানুষের চিন্তার চেতনার সংস্কৃতির-ও আধার ও আধেয় হয়ে দাঁড়াল একটাই — পশ্চিমের আলোচনা — ডিসকোর্স অফ দি ওয়েস্ট। শর্টে, এটাই হল এনলাইটেনমেন্ট, যাকে সোহাগ করে নানা জন নানা নামে ডাকেন, রেনেসাঁ, নবজাগরণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের আদ্যিকালের বাস্তবতার, কুসংস্কার এবং অজ্ঞানের নিবিড় তমসা দূর হল, তমসো মা জ্যোর্তিগমগম করতে লাগল চারদিক পশ্চিমের আলোয় আর সদ্য বুলি ফোটা নতুন ডিসকোর্সের কলকোলাহলে।

সেই তীব্র নিবিড় মাদকতাময় এবং সর্বব্যাপী গাজরের, মানে সাম্যের ভিত্তিটা কী ছিল? কিছু অধিকার। হেগেলের ফিলোসফি অফ রাইটের আর ফেনোমেনোলজির অনবদ্য যুক্তিগঠনের অলঙ্কারে বলতে গেলে, সমাজশাসক প্রভুর দাসেরা মানে ছাগলের থার্ড বাচ্চারা যারা মালিকের প্রয়োজন মেটাতে মেটাতে হেদিয়ে যেত, আর স্বপ্ন দেখত স্বর্গের, সেখানে ঈশ্বরের শাসন, তার চোখে সবাই সমান, সেই স্বপ্নের ভগবান জ্যান্ত দুপায়ে হেঁটে চলে বেড়াতে শুরু করল পুঁজি সমাজের বাজারের রাস্তায়। ঈশ্বরের জায়গায় আইন, আইনের চোখে আমরা সবাই সমান। আমাদের সম্পত্তির উপর আমাদের অধিকারে, অন্য যে কোনো মানুষের সঙ্গে চুক্তি করার অধিকারে — আমরা প্রত্যেকে অন্য প্রত্যেকের সমান। মার্ক্স সিনে এসেছিলেন ঠিক এই জায়গাটায়, পুঁজি সমাজের এই সাম্যের পিছনে গোপন অসাম্যটাকে বার করে এনেছিলেন জনসমক্ষে। আলোচনা করেছিলেন, পুঁজির এই সাম্য ভেঙে কেমন করে আমরা যথার্থ সাম্যের সমাজে পৌঁছব তার নিয়মকানুন।

কিন্তু সে তো গেল পরের কথা, পুঁজি সাম্য বস্তুটা জ্যান্তচোখে যা তার পিছনে আসলে কী। ওই চুক্তির অধিকার সম্পত্তির উপর অধিকার সাম্যের অধিকার ওটুকুকেও বারবার লঙঘণ করে পুঁজি সমাজ। সে

আলোচনা আমরা করেছি সিম্পটম নিয়ে আমাদের আলোচনায় (অনুষ্টুপ, শারদীয়, '৯৮, '৯৯, '০০) — পুঁজি কী ভাবে তার নিজেরই ঘোষিত স্লোগান এই সাম্য ধারণাকে ভেঙে দেয় বারবার, তার মুনাফার স্বার্থে, বাজারের স্বার্থে। তবু যে সাম্যটা পায় পশ্চিমের নিজের নাগরিকরা — সাহেবরা তাদের নিজেদের দেশে যে ন্যূনতম অধিকারটুকু পায়, আমাদের জন্যে সেটুকুও রইল না। আমাদের এখানে, মানে উপনিবেশগুলোয়, মানে অনেক পরে আমরা যারা স্বাধীনতা পেয়ে তৃতীয় বিশ্ব হব আমাদের সেই দেশগুলোয়, আমাদের পশ্চিমের প্রভুরা যে মাল ছড়াল তা আরো সরেস। পশ্চিমের নিজের দেশের পুঁজি সমাজের চালু অধিকারটুকুও আমরা পেলাম না। সেটুকু যদি আমরা পাই তাহলে কলোনাইজার আর কলোনাইজড-এর, ঔপনিবেশিক প্রভুর আর প্রজার প্রয়োজনীয় পার্থক্যটুকুই তো আর থাকে না। তাই, এই উপনিবেশগুলোয় যা চালু হল তা আর এক বিচিত্র সার্কাস, তার নাম ঔপনিবেশিক সাম্য। উত্তরউপনিবেশ নিয়ে আমাদের আলোচনায় (অনুষ্টুপ, বইমেলা, ২০০২) আমরা সেটা দেখিয়েছি। পুঁজিবাদী সাম্য আসলে নকল সাম্য। সেই নকলের নকল ঔপনিবেশিক সাম্য — তাকেও কেমন বারবার ভেঙে দিত ঔপনিবেশিক শাসন — ঔপনিবেশিক সাম্যের সেইসব সিম্পটম।

কিন্তু, এবার লক্ষ্য করুন, উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক তলে এই সাম্য ধারণাটাই কেমন জটিল হয়ে পড়ে। প্রথম সাম্য, মানে মডার্নিস্ট সাম্য, এনলাইটেনমেন্টের সাম্য, পুঁজির সাম্য — এই সাম্য ধারণাটা একটা ধনাত্মক সংজ্ঞা, মানে, নির্দিষ্ট কিছু শর্ত আছে, এই এই জিনিষ এই এই অধিকার যদি আমরা পাই তাহলে সাম্যটা আছে, নইলে নেই, সেক্ষেত্রে প্রভু দাসকে শাসন করছে, শোষণ করছে। কিন্তু উত্তরআধুনিকতা তো কোনো হায়েরার্কি কোনো ক্রমকেই রাখল না, কোনো সাদা আর কালো রইল না, কোনো বিশুদ্ধ প্রভু বা বিশদ্ধ দাস আর রইল না, তার মানে কোনো স্পষ্ট হায়েরার্কিই রইল না আর। তার মানে, একটা ভাঙনের পথ বেয়ে, একটা সামগ্রিক কেলোর গহ্বরের মধ্যে আবার আমরা সমান হলাম। কোনো শালাই যদি আর প্রভু না হয়, দাস না হয়, সাদা না হয়, কালো না হয়, তাহলে আবার আমরা সবাই আমরা সবার সমান, আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু-নই হওয়ার সাপেক্ষে, কারণ আমরা তো কেউই তো আর কেহ নই কিছু নই গো। তুমিও শূন্য আমিও শূন্য — বল জয় ব্যোমশঙ্কর। গোটা উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক তত্ত্বআলোচনাই এই কিছু না হয়ে পড়ার ঋণাত্মক সমতার ধারণায় আক্রান্ত।

কিন্তু অন্য প্রতিটা সমতার ধারণার মতই উত্তরআধুনিক এই সাম্য ধারণাটাও আসলে একইরকম বাকোয়াস। সেটা বোঝার জন্যে আমাদের দরকার পড়ে মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন এর ধারণা যা কাজ করে একটা সিন্থেটিক শাসনের তলে। অন্যত্র অত্যন্ত বিশদে এই আলোচনা করা হয়েছে, তবু এখানে সেই সিন্থেটিক শাসন নিয়ে দু একটা কথা বলে নেওয়া যাক।

বাইনারি মডেল বা দুই মেরুর বৈপরীত্যের নিরিখে বাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টা অন্য অনেক দার্শনিক কাঠামোর মত মার্ক্সবাদের একটা চালু প্রবণতা। যার অন্য নাম ডায়ালেক্টিক্স। একটা স্তরের ডায়ালেক্টিক্স কাজ করে মূর্ত আর বিমূর্তর মধ্যে। আর একটা স্তরের ডায়ালেক্টিক্স কাজ করে সমাজ বাস্তবতার সমগ্রের স্তরে। সমাজ বাস্তবতার সমগ্রের একটা টেকনিকাল নাম ইউনিভার্সাল। ঠিক হেগেলের ইউনিভার্সালের মতই মার্ক্স-এর ইউনিভার্সাল-ও নিয়তই বিবর্তিত হতে থাকে ইতিহাস বেয়ে। বিবর্তিত হতে হতে ক্রমশঃ সে তার উচ্চ থেকে উচ্চতর থেকে উচ্চতরতর মুহূর্তে উন্নীত হতে থাকে। পথের শেষ কোথায় খুঁজতে খুঁজতে একদিন তার জার্নি শেষ হয়, সে টার্মিনাসে পৌঁছে যায়, হেগেল আর মার্ক্স দুজনেই এই পথের শেষের রূপকথায় আক্রান্ত ছিলেন, যেমন শান্তির রূপকথার টানে বসা-ষাঁড় আর তার সঙ্গীরা নিজেদের ভাইদের বোনদের ছেলেদের মেয়েদের মৃতদেহ তুষারে ছড়াতে ছড়াতে আর তাদের পারলৌকিক আচারের মৃত্যুসঙ্গীত গাইতে গাইতে বরফঢাকা পাউডার নদী পেরিয়ে চলে গিয়েছিল কানাডায়। কিম্বা তাসের দেশের বিপ্লবের অগ্রদূত বিদেশী রাজপুত্র ফুসলে নিয়ে গেছিল দেশী মিস ইন্ডিয়া হরতনীকে।

এই রূপকথার টানেই হেগেল তার পথের শেষ খুঁজেছিলেন পুঁজিবাদের বাজারের রাস্তায়। কারণ সেখানে প্রতিটি নাগরিকের জন্য চুক্তির অধিকার স্বীকৃত, সম্পত্তির উপর অধিকার স্বীকৃত। নইলে তো পুঁজিবাদী উৎপাদনই চলতে পারে না, যদি না শ্রমিকের অধিকার থাকে তার নিজস্বতম সম্পত্তি তার নিজের

কাজ করার ক্ষমতা মানে তার নিজের শ্রমশক্তি বিক্রি করার, বিক্রি করে নিজের আর নিজের পরিবারের জন্যে দুবেলার দুমুঠো আহার যোগাড়ের। আর এই শ্রমশক্তি বেচতে গেলেই তো তাকে কাজের চুক্তিতে আসতে হবে, যে প্রত্যহ আটঘন্টা করে তার শরীরের পেশীর স্নায়ুর সমস্ত ক্ষমতার মালিক সে নিজে নয়, তার সঙ্গে ওই কাজের চুক্তিতে এসেছে যে পুঁজিপতি, যার পুঁজি দিয়ে গঠিত হয়েছে ওই কারখানা, সেই আদেশ দেবে ওই শ্রমশক্তিকে। এই চুক্তিতে প্রবেশ আর নিষ্ক্রমণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে মালিক আর শ্রমিক উভয়পক্ষেরই, তারা দুজনেই সেখানে সমান। (আমাদের রাজনীতিনিবিড় কৈশোরে আর প্রথম যৌবনে যার বই তো বটেই, গোটা জীবনটাই আমাদের অনেক রোমাঞ্চ দিত সেই ক্রিস্টোফার কডওয়েলের লেখাতেই প্রথম পাই এই প্রশ্নটা, বোধহয় স্টাডিজ ইন এ ডায়িং কালচার, সেই পরস্পর সমান চুক্তির অধিকার আসলে কী হয়ে দাঁড়ায় মালিক আর শ্রমিকের কাছে? শ্রমিকের কাছে চাকরি ছেড়ে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরার অধিকার, আর মালিকের কাছে ছাঁটাই আর লকআউট করে শ্রমিকদের টাইট রাখার অধিকার। কডওয়েল যে শব্দদুটো ব্যবহার করেছিলেন এখানে, 'হায়ার' আর 'ফায়ার', পড়ার পরে কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না, মানে কী? মালিকের অধিকার আছে শ্রমিককে গুলি করে দেওয়ার? তখনো 'ফায়ার' মানে চাকরি থেকে ছাঁটাই সেটা জানতামই না আমরা, গ্রামের মফস্বলের চাঁদ চাওয়া বিপ্লব চাওয়া বালকেরা।)

আইনের চোখে আপামর নাগরিকের এই সমানতা নিয়ে আসে পুঁজি, এটাই তো ঈশ্বর, তাই এখানেই সমাজবাস্তবতার ওয়াকিং রেস থামিয়ে দিলেন হেগেল। মার্ক্স বললেন, না, ওখানে নয়, পথের শেষ সাম্যবাদে মানে কমিউনিজমে। মার্ক্স এর সেই এলডোরাডো, স্বপ্নের ফ্যান্টাসির সোনার দেশ। এবং এই এলডোরাডোয় পৌঁছে আরামের নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে সাম্যবাদী কোকাকোলার ক্যানে চুমুক দেওয়ার আগে সমাজবাস্তবতার সমগ্র মানে ইউনিভার্সাল একের পর এক অতিক্রম করে এসেছে তার ক্রমে ক্রমে উন্নততম হয়ে ফুটে ওঠার আগের নিম্নতর মুহূর্তগুলো। মানে, সমাজ বিবর্তনের স্তরগুলো। এই ছকটা আবার দেশ থেকে দেশে হুবহু এক নয়। পশ্চিম ইউরোপের জন্য প্রাথমিকভাবে বানানো এই ছকটার সঙ্গে এশিয়ার বা পূর্ব ইউরোপের বা অন্যান্য জায়গার কিছু কিছু তফাত আছে। সেই মূল ছকটা হল :—

ক। আদিম সাম্যবাদ, যার আবার দুটো ভাগ

শিকারী সংগ্রাহক

যাযাবর পশুপালক

খ। দাসব্যবস্থা

গ। সামন্ততন্ত্র

ঘ। পুঁজিতন্ত্র

ঙ। সমাজবাদ মারফৎ সাম্যবাদ

এর মধ্যে ক থেকে ঘ আমরা জানি আমাদের ইতিহাস জুড়ে। আর ঙ হল সেই ভবিষ্যত যার স্বপ্ন দেখালেন মার্ক্স। আবার এখন এই ঙ এক অর্থে আমাদের অভিজ্ঞতারও অংশ। আমরা রাশিয়া পূর্ব ইউরোপ চিন কিউবায় এবং আরো ছুটকো ছাটকা কোথাও কোথাও সমাজবাদকে বাস্তবে প্রয়োগ হতে দেখেছি।

এবার, যা বললাম, মার্ক্স-এর ইউনিভার্সাল-ও তো, ঠিক হেগেলের মতই, ক্রমে বদলাতে বদলাতে, মানে বিবর্তিত হতে হতে তার উচ্চতর মুহূর্তের দিকে যেতে থাকে। মার্ক্স-এর যুক্তিকাঠামোয়, ঠিক হেগেলেরই মত, সেই বিবর্তনের পদ্ধতিটা, অন্য আর সবকিছুর মতই, দ্বান্দ্বিক মানে ডায়ালেক্টিকাল। দুই মেরু সাদা আর কালো থিসিস আর অ্যান্টিথিসিস এর পারস্পরিক লড়াইকে ঘিরে গজিয়ে চলে সমাজবিবর্তনের পথ। সামন্ততন্ত্র বা ফিউডালিজম থেকে পুঁজিতন্ত্র বা ক্যাপিটালিজমে রূপান্তরের কথাই ভাবা যাক। মার্ক্সবাদী এই লজিক অনুযায়ী, সমাজবাস্তবতা শরীরে নতুন আবির্ভূত হয়ে ক্রমে আকার পেয়ে গজিয়ে উঠতে থাকা পুঁজিতন্ত্র যদি থিসিস হয়, তার অ্যান্টিথিসিস হল আবহমান সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামো, যা থিসিসকে পিছনদিকে টানছে। চিরাচরিত মার্ক্সবাদী মডেলে থিসিস আর অ্যান্টিথিসিস এর লড়াই শেষ হয় সিন্থেসিস-এ যেখানে ফিউডালিজম অবশেষহীনভাবে অবলুপ্ত। যতদিন সেটা না হচ্ছে ততদিন সেটাকে থিসিস পুঁজিতন্ত্রের ব্যর্থতা বলে ভাবা হবে। এটাই সরল শাসন বা সিম্পল হেজেমনির মডেল। নতুন ভ্রূণ শাসকশ্রেণী

মানে পুঁজিপতি যেখানে প্রাক্তন শাসকশ্রেণীকে মানে সামন্ত প্রভুদের চূড়ান্ত ভাবে অপসারিত করে। হেজেমনি হল শ্রেণীশাসনকে চূড়ান্ত করে তোলার প্রক্রিয়া, যেখানে শ্রেণীশাসন চারিয়ে যায় মন মগজ মতামত অব্দি। যখন শাসিত শ্রেণী মানে শ্রমিকরাও শাসকশ্রেণীর পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্দেশ্যকে নিজের উদ্দেশ্য বলে ভেবে ফেলে। সমাজবিবর্তনের প্রতিটি স্তরেই পুরোনো সমাজব্যবস্থাকে অপসারিত করে নতুন ব্যবস্থা। নতুন ব্যবস্থার জন্মটা শুরু হয় সমাজের চালু সম্পত্তি সম্পর্ক আর উৎপাদিকা শক্তির ভিতর দ্বন্দ্ব থেকে — কিন্তু সেই আলোচনা অন্যত্র যথেষ্ট হয়েছে।

গ্রামশি দেখালেন যে থিসিস পুঁজি যদি অ্যান্টিথিসিস মানে প্রাকপুঁজির অবশেষহীন অবলোপ ঘটিয়ে উঠতে না-পারে তার মানেই যে থিসিসের ব্যার্থতা তা নাও হতে পারে। এমন হতেই পারে অবলোপের ওই আপাত-অভাবটা আসলে অন্য রকম একটা সফলতা, আর এক অর্থে আর একটু জটিল একটা সফলতা। দেশকালের ভাবগতিক দেখে থিসিস নিজেই চেয়েছে অ্যান্টিথিসিসের এই অসম্পূর্ণ অপসারণ, অন্যরকম একটা সিন্থেসিস — এমনটা হতেই পারে। গ্রামশির এই কমপ্লেক্স হেজেমনি এমন একটা সিচুয়েশন যেখানে ভ্রূণ পুঁজি বুঝেছে যে সম্পূর্ণ অপসারনের পদ্ধতিতে যে রাজনৈতিক গড়বড় ঘোটালা তৈরি হবে তা এমনকি তার নিজের স্বাস্থ্যের পক্ষেও বিপজ্জনক হতে পারে, তার চেয়ে বাপ, দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে — দেখো সামন্ত তুমি আর আমি কেমন এক হয়ে গেছি, আমার মধ্যেই এখন তুমি। মানে অ্যান্টিথিসিসের একটা অংশকে সে রেখে দেবে নিজের ভিতরেই। থিসিসের ভিতরেই বসবাস করবে কিছুটা অ্যান্টিথিসিস। একটু আগে আমরা যে বলেছিলাম, অতিনির্ণয় মানে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে মিশে যাওয়া নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু — সেটা এবার খেয়াল করুন। কমপ্লেক্স হেজেমনি এই মিলে মিশে থাকা। টেকনিকাল ভাষায় বলতে গেলে, সরল অবশেষহীন সিন্থেসিস যখন হল না, এসো একটা মিলিজুলি সারোগেট সিন্থেসিস পাকিয়ে তোলা হল, যার নাম কমপ্লেক্স হেজেমনি। আর অতিনির্ণীত থিসিস আর অ্যান্টিথিসিসদের নিয়ে যে সিন্থেসিস আমরা পাই সেটা কমপ্লেক্স হেজেমনি থেকে যোজন যোজন আলাদা, তার নাম সিন্থেটিক হেজেমনি।

এই কমপ্লেক্স হেজেমনির জটিলতাকে আরো জটিল করে তুলুন, উত্তরআধুনিকতাকে নিয়ে আসুন। যখন দ্বন্দ্ব নামক ধারণাটাই আরো জটিল হয়ে উঠল। ডায়ালেক্টিক্স দিয়ে আর চলল না, আনতে হল ওভারডিটারমিনেশন। মানে, এককথায়, তুমি আর নেই সে তুমি, কালো আর নেই সে কালো, সাদা আর নেই সে সাদা। সাদা নির্ণীত আর নির্মিত হচ্ছে কালো দিয়ে, আবার কালোও তাই। যখন ঐতিহ্য মানে ট্রাডিশন আর আধুনিকতা মানে মডার্নিজম দুটো পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট কর্তিত সত্তা নয় আর। ট্রাডিশন দিয়েই পাকানো হয়েছে মডার্নিজম আর মডার্নিজম দিয়ে তৈরি হয়েছে ট্রাডিশন। থিসিসের আর অ্যান্টিথিসিস দুজনেই দুজনের দ্বারা অতিনির্ণীত।

থিসিস আর অ্যান্টিথিসিস যদি বদলে গিয়ে থাকে তাদের সিন্থেসিস-ও তো বদলে গিয়েছে। এই নতুন সিন্থেসিসই হল সিন্থেটিক হেজেমনি। অন্যত্র আমরা সবিস্তারে সেই আলোচনা করেছি, এখানে এইটুকুই থাক। এবার আসুন দুই নম্বর সেকশন থেকে আমরা হেগেলের তত্ত্বে শাসন সংক্রান্ত ধারণা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করি।

২।। বাসনা মৃত্যু চেতনা

হেগেলের ফেনোমেনলজি অফ স্পিরিট তার যাত্রা শুরু করেছে মানুষের বাসনা থেকে — ডিজায়ার। এটাই ফেনোমেনলজির প্রাথমিক বর্গ। বাসনা মানে আত্তীকরণের ইচ্ছে। মানুষ যা দেখে সামনে তাই নিজের করতে চায়। তার সামনে যখন অন্য মানুষ এসে দাঁড়ায় সে তাকেও আত্তীকরণ করতে চায়, নিজের অন্যান্য অধিকারের মত আর একটা অধিকার করে তুলতে চায়। এই নিজের করে নিতে চাওয়াটাই তার চোখ খুলে দেয়। সে তার চারপাশে সবকিছুকে নিরীক্ষণ করে, তার আপামর অপরকে, মানে তার নিজের বাইরে আর যা যা আছে। বোঝার চেষ্টা করে — আরো কী কী সেখানে আছে যা সে নিজের করে তুলতে পারে। উপযোগী কোনো একটা কিছু সামনে দেখা মাত্র সে তার উপর নিজের ক্রিয়াকে নামিয়ে আনে, যার শেষে

ওই দ্রব্য বা বস্তু বা জীব বা মানুষটি তার নিজের হয়ে ওঠে, তার সাম্রাজ্যের আর একটা অংশ, তার সাম্রাজ্য আরো বেড়ে ওঠে। ওই দ্রব্য বা জীব বা মানুষটির আর কোনো নিজস্ব অস্তিত্ব থাকে না, সে হয়ে ওঠে ওই দর্শক কাম ক্রিয়াশীল মানুষটির মানে কর্তাটির একটি কর্ম, অনেক কর্মের মধ্যে আরো একটা।

কিন্তু তার মানেই, ওই প্রাথমিক বাসনার মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে একটি মৃত্যু বাসনা, ডেথ ড্রাইভ। নিজের অপরের, আদার-এর এই নিধন বা অবলোপের মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয় মানুষের বাসনা। এই নিধনলালসাই তাকে তার নিজের অস্তিত্বের যাত্রায় জাগিয়ে নিয়ে চলে — আরো অধিকার, আরো সাম্রাজ্য, আরো কর্ম, আরো আরো অপরকে তার নিজের অস্তিত্বে অনস্তিত্ব করে দেওয়া। সামনে দেখে ধানক্ষেত, ওই ফসল তার নিজের হয়, ফসলের জমি, জমির উপর উড়ে বেড়ানো পাখি, পাখির ডানায় সূর্যোদয়, সেই সূর্যোদয় দেখে আকুল হয়ে ওঠা বালকের উত্তেজিত চোখের মণি, সবকিছুকেই সে নিজের করে নেয়।

তার এই বাসনার কোনো সীমা নেই, সব সময়ই সে আরো চায়, আরো আরো এবং আরো। সে শুরু করেছিল দ্রব্য বস্তু জড়জগত থেকে, প্রকৃতি থেকে। (আমাদের কৈশোরহিরো কডওয়েলের একটা বিখ্যাত বাতেলা অনুবাদ করে আমরা পার্টি জেলা কনফারেন্সের দেওয়ালে সেঁটেছিলাম, মানুষের ইতিহাসের দুটো মাত্র উপাদান, প্রাকৃতিকায়িত মানব আর মানবায়িত প্রকৃতি, হঠাৎ মনে পড়ল।) কিন্তু কচু কাটতে কাটতে একদিন ডাকাত হওয়ার উল্লাসে, সততই সে একদিন প্রসারিত হয়েছিল চারপাশের অন্যান্য মানুষের দিকে। যারা তার মতই মানুষ, তাই তারই মত বাসনার বদ্ধজীব, মানে একই রকম ঘোড়েল আর ত্যাঁদোড়, যারা একই রকম করে জঙ্গল কেটে পত্তন করছে বসতি, আদিগন্ত প্রসারিত ঝোড়ো হাওয়ার ছুটোছুটিকে করে দিচ্ছে চৌখুপি কাটা পর্চার ম্যাপে জমির দাগনম্বরের দলিল। যারাও তারই মত অ্যাদ্দিন ধরে প্রকৃতিকে হজম করতে করতে এবার অন্য মানুষের দিকে হাত বাড়িয়েছে। এবার, অনিবার্য ভাবেই, যা হবার তাই হবে, মানে দুই দিক থেকে দুই বাড়ানো হাতের মধ্যে হাতাহাতি। মানে যুদ্ধ।

দুজনের দিক থেকেই মরণপণ এই যুদ্ধে দুজনেই চায় অন্যজনকে অধিকার করতে। শেষ অব্দি সবলতর পক্ষ জয়ী হয়, এবং অন্যজন আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণ তাকে করতেই হয়, কারণ, বেঁচে থাকাটা তো শেষ অব্দি সবচেয়ে জরুরি, বাসনার চেয়েও বেশি বাসনার। জীবন আর মৃত্যুর সাদা আর কালোর আবছায়া ধূসরের সেই দেশে গিয়ে পৌঁছয় পরাজিত যোদ্ধা, যুদ্ধ পেরিয়ে, বাসনা পেরিয়ে, এবং এবার তার হাতে হাত রাখে সেই বোধ, মৃত্যুবোধ, পরম সেই জ্ঞান। এইমাত্র সে তো মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে এল। জীবন মৃত্যু বাসনা এবং যুদ্ধ পেরিয়ে এসে এইবার সে সিদ্ধান্ত নেয় দাস হওয়ার, দাসত্বে বাঁচার, জয়ী যোদ্ধা মানে প্রভুর শাসনের দাসত্বে। নির্মিত হয় প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক। বাস্তবতার একটা দুইমেরুবিন্যস্ত তল। আর চৈতন্যের জগতে আসে একটা নতুন উপাদান, জীবনমৃত্যুর সাদাকালোকে অতিক্রম করে, বাসনা ও যুদ্ধ অতিক্রম করে একটা নতুন চেতনা — দাসচেতনা।

জয়ী প্রভু, তার জয়ের কারণেই কিন্তু, অভিশপ্ত হল, নির্বাসিত হল, সেই নবআবিষ্কৃত চেতনার জগতে তার প্রবেশ নিষেধ। তার আর কোনো বদল হল না, সে রয়ে গেল একইরকম, অবিকৃত, জড়। অপ্রতিহত আর তাই অপ্রতিরোধ্য বাসনা যাকে নিয়ে খেলা করে। বাসনা পেরিয়ে সেই ধূসর জগতের ঠিকানা সে জানতেই পারল না। তার কোনো অপর নেই বাহির নেই। যা ছিল তাকে সে দাসত্বে পরাভূত করেছে, ব্যক্তিদের সে দাস মানে বস্তু করে দিয়েছে আগেই। তাই সে একা, তার চারপাশে শুধু জড়জগত, তার ভোগের বিভিন্ন বস্তুর সেই জগতে সে নিজে ছাড়া আর কোনো ব্যক্তি নেই, তাই সে কারো কাছ থেকে কিছু শিখতেও পারে না। অশিক্ষিত স্থবির একা সে বাঁচে তার বাসনার এবং ভোগের পৃথিবীতে, চৈতন্যহীন গোদা জড়দগব। কিন্তু দাস তা নয়। সে শেখে, নিয়তই শেখে, শিখতে তাকে হয়ই, প্রভুর প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে তাকে শ্রম দিতে হয়, শ্রম দেওয়ার জ্যান্ত প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে সে প্রকৃতিকে চেনে, বাস্তবতাকে চেনে।

দাস শিখেই চলে। সে চোখের সামনে দেখে তার প্রভুকে। প্রভুত্বের, ক্ষমতার, স্বাধীনতার জগত। স্বাধীনতার জ্যান্ত শরীর তার সামনে তার প্রভু — জয়ী, স্বাধিকারপ্রমত্ত। হাত পা নেড়ে ঘুরে বেড়ানো স্বাধীনতাকে চোখের সামনে দেখে দাস, দু চোখ ভরে, দেখতে দেখতে সে চিনতে পারে কাকে বলে স্বাধীনতা, যা তার নেই কিন্তু ওই প্রভুর আছে। স্বাধীনতার স্বরূপ চেনে দাস, অনেক দুঃখে বেদনায় অনুরাগে,

কারণ এই শতবার করে চেনা স্বাধীনতা সবসময়ই তার ধরাছোঁয়ার বাইরে। পরাজয়ের ভিতর সে মৃত্যুকে চিনেছিল, এবার বন্দীত্বের মধ্যে সে চিনল স্বাধীনতাকে আর প্রভুর জন্যে শ্রম দিতে দিতে, বাস্তবতাকে চিনল দাস — প্রভুর বাস্তবতা। চোখের সামনে স্বাধীনতাকে দেখতে দেখতে এবং না পেতে পেতে এবার তার চূড়ান্ত চৈতন্যোদয় হল, সে চিনতে শিখল চিন্তার জগত। আর একটা বাস্তবতা, চিন্তার পৃথিবী, এই পৃথিবীতে পরাধীন হলে কী হয়, ওই পৃথিবীতে সে মুক্ত, যা খুশি সে ভাবতে পারে। তার চিন্তার জগতে বিস্ফোরণের এই মুহূর্তটাকে মুক্তির সেই প্রথম মুহূর্তটাকে হেগেল নাম দিলেন স্টোইসিজম। (স্টোইক বলতে বোঝায় এমন কেউ যে আনন্দ দুঃখ বাসনার পুরন বা অপুরন সবকিছুকেই সমান ভাবে নেয়, সবকিছুতেই একইরকম অবিচলিত থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব তিনশো নাগাদ গ্রীক দার্শনিক জেনোর থেকে শুরু হয়েছিল দর্শনের বিশ্ববীক্ষার এই ধারা, স্টোইসিজম, যারা বিশ্বাস করত মানুষের চেষ্টা করা উচিত তার আবেগ-উচ্ছ্বাস থেকে মুক্ত হওয়ার, এবং সবকিছুই একইরকম অবিচল ভাবে গ্রহণ করার। কারণ, যা ঘটে তা সবই তো ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটে। আমাদের প্রচলিত জনপ্রিয় নিয়তি ধারণার এটা কাছাকাছি আসে।)

দাসের সচেতনতায় এবার পরপর যে স্তরগুলো আসতে পারে তার পরবর্তীটা হল সেপ্টিসিজম, আলগা অনুবাদ করা যায় সংশয়বাদ। দাস এখন স্টোইকের ওই মুক্তিধারণাকে সন্দেহ করে, আদৌ ওটা কোনো মুক্তি কিনা। কী সেই মুক্তি যা কখনো শরীরী অবয়বে প্রত্যক্ষ করা যায় না? স্টোইকের মুক্তিধারণাকে নাকচ করে নেগেট করে আসে সেপ্টিসিজম, সংশয়। এই নিগেশন ফের নিগেটেড হয় (হেগেলের ডায়ালেক্টিক্স-এর ছক এটাই, নিগেশন, নিগেশনের নিগেশন)। স্টোইসিজমকে নিগেট করে সেপ্টিসিজম, তাকে নিগেট করে এবার আসে আনহ্যাপি কনশাসনেস। অসুখী চৈতন্য। যা বাস্তবতায় পরাধীন ও অসুখী দাসের জন্যে কায়েম করে একটা সুন্দর ভুবন, স্বর্গরাজ্য। স্বর্গই তো তাই, যা মাটির পৃথিবীতে এই জীবনে হল না, কিন্তু মৃত্যুর পরে ওই পৃথিবীতে সেখানে আর কোনো বন্দীত্ব নেই, শুধু ওই চিন্তার জগতের স্বাধীনতার শিকের নিচে বেড়ালের মত বেঁচে থাকা নয়, সবাই সেখানে স্বাধীন, সত্যিই স্বাধীন, ভগওয়ানকে ঘর দের হ্যায় আন্ধের নেহি হ্যায়।

অসুখী চৈতন্যের হেগেলীয় ধারণার ভিতরে দাসের চেতনাজগতের আগের মুহূর্তদুটো মানে স্টোইসিজম আর সেপ্টিসিজম দুটোই এবার হাজির থাকে, একটা ঐক্যবদ্ধ অবয়বে। (থিসিস, অ্যান্টিথিসিস — তাদেরকে মিলিয়ে সিন্থেসিস।) আনহ্যাপি কনশাসনেস মানে স্টোইসিজম নয় কারণ এই স্বর্গ তাকে একটা সত্যিকারের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখায়, যদিও তা এই লৌকিক পৃথিবীকে পেরিয়ে, পরলোকে। (বিভূতিভূষণের দেবযান একটা চমৎকার ছক, ইস্কুলে হেগেলের ক্লাসে এই উপন্যাসটা পড়ানোই যায়, যেন যতীনের আনহ্যাপি কনশাসনেসের উদাহরণ দিতে গিয়েই লেখা হয়েছিল। উননববই-এ, 'সমাজবিজ্ঞান' পত্রিকায় লিখেছিলাম বিভূতিভূষণের অলৌকতাকে পাওয়ার ডিসকোর্স হিশেবে একটা আলোচনা। আর হেগেলের এই ফেনোমেনোলজি নিয়ে এখনো বাংলায় বা ইংরিজিতে আমার পড়া শ্রেষ্ঠ লেখা সাতাশিতে পুজো অনুষ্টুপে বেরোনো অজিত চৌধুরীর 'জাতকের গল্প', অনবদ্য একটা গদ্য, এতবছর পরেও এটা লিখতে গিয়ে সেই লেখাটার বাক্যের প্রভাব এড়াতে আমার প্রায় ব্যায়াম করতে হচ্ছে।) কিন্তু স্টোইসিজমের মুক্তির স্বপ্নের পাশাপাশি সেপ্টিসিজমের সংশয়টাও রয়ে যায় আনহ্যাপি কনশাসনেসে — এই মুহূর্তে এই পৃথিবীতে সে তো মুক্ত না, প্রভুর শাসনে শৃঙ্খলিত। হেগেলের এই যুক্তিগঠন তার ফাইনাল চেহারাটা পায়, সত্যিই মূর্ত হয়ে ওঠে এই মাটির পৃথিবীতে, এখানে এবং এখন, যেমন আগেই বলেছি, ইউনিভার্সালের টার্মিনাসে পৌঁছনোর পর, মানে ক্যাপিটালিজমে। যখন ঈশ্বরের নতুন প্রতিমা আইনের আইনবিভাগের সংবিধানের চোখে সবাই সমান হয়ে ওঠে। হেগেলের সেই চূড়ান্ত সমাজ, যার পরে আর কোথাও যাওয়ার নেই।

হেগেলের লজিকে এই পরপর তিনটে স্তরকে ভাবুন — ক)স্টোইসিজম, খ)সেপ্টিসিজম, গ)আনহ্যাপি কনশাসনেস। আমরা এইভাবে দেখছি যে প্রথম মানে স্টোইসিজম হল থিসিস, তাকে নিগেট করে আসছে দ্বিতীয়টা মানে সেপ্টিসিজম বা অ্যান্টিথিসিস, এবং তাদের সিন্থেসিস হল তৃতীয়টা মানে আনহ্যাপি কনশাসনেস, যা ওই থিসিস আর অ্যান্টিথিসিসকে একটা উচ্চতর তলে নিয়ে যাচ্ছে। এবার এই 'প্রথম'

'দ্বিতীয়' আর 'তৃতীয়' — এই তিনটে শব্দকে ভাবুন। একটা ক্রম, একটা কালানুক্রমে সাজানো পরপর তিনটে। মানে ইতিহাসের একটা গতিমুখ। একটার পরে আর একটা, ঐতিহাসিক সময়ের একটা হায়েরার্কি। হেগেলের তত্ত্বে, বিশেষতঃ হেগেলের কমবয়সের তত্ত্বগুলোয় এই কালানুক্রমিক ইতিহাসবাদ প্রায় সর্বব্যাপী। অন্যত্র খুবই বিশদ ভাবে আলোচনা আছে, তবু বলে নিই, ইতিহাসবাদ বা হিস্টরিসিজম হল ইতিহাসের পরম্পরা মোতাবেক স্তরবিন্যাসে বাস্তবতাকে ভাবার মডেল। ধরুন সামন্ততন্ত্রের পর পুঁজিবাদ, পুঁজিবাদের পর সমাজবাদ, ইত্যাদি। অন্য আর সমস্ত হায়েরার্কির মত উত্তরআধুনিকতা এই সময়ের হায়েরার্কিকেও আক্রমণ করে। মানে, সময়ের গতিমুখ যেখানে গুবলেট হয়ে গেছে। কোনটার পরে কোনটা সেই নির্দিষ্ট ক্রমটা যখন আর নেই। উত্তরআধুনিকতা মনে করে এই ক্রোনলজি বা সময়ের গতিমুখ বরাবর বাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টার মধ্যে একটা যান্ত্রিকতা থাকে। একটা জ্যান্ত বাস্তবতায় সময়ের গতিমুখ আসলে ঘেঁটে যাবেই, আগামীকালের মধ্যে কিছুটা গতকাল থাকবেই, গতকাল দিয়ে কিছুটা আজ গজিয়ে উঠবেই। বা এককথায় বললে, আবার সেই ওভারডিটারমিনেশন, মানে কাল আজ আগামীকাল এগুলো যখন আর স্পষ্ট বিচ্ছিন্ন কর্তিত সত্তা থাকছে না, প্রত্যেকে অন্য প্রত্যেকের দ্বারা নির্মিত এবং নির্ণীত হচ্ছে। আর তাই উত্তরআধুনিক তত্ত্বচর্চা সময়ের ওই ঘননিবদ্ধ গতিমুখ দিয়ে ভাবাটাকে আর এক রকমের এসেনশিয়ালিজম বলে ভাবে, এবং ডাকে ইতিহাসবাদ বা হিস্টরিসিজম বলে।

৩।। টেলস, র‍্যাশনাল অর্ডার, ডিনামিক্স এবং হিস্টরিসিজম

হেগেলের ইতিহাসবাদী ঝোঁককে স্পষ্ট করা যায় তার সুপারসেশন বা অতিক্রমণের ধারণা দিয়ে। সুপারসেশন হল হেগেলের ইউনিভার্সালের একটা মুহূর্তকে তার পরবর্তী এবং তাই উচ্চতর মুহূর্তের অতিক্রম করে যাওয়ার টেকনিকাল নাম। আমরা আগেই যে উল্লেখ করে এসেছি, হেগেলের সমাজবাস্তবতার সমগ্র মানে ইউনিভার্সাল ক্রমশঃ বিবর্তিত হতে থাকে। নিম্নতর মুহূর্ত থেকে উচ্চতর মুহূর্তে। লোয়ার মোমেন্ট থেকে হায়ার মোমেন্টে। হতে হতে একসময় সে তার উচ্চতম বিন্দুতে বা টার্মিনাসে পৌঁছয়। অর্থাৎ প্রথম থেকেই তার একটা আরব্ধ আছে, একটা পৌঁছতে চাওয়া, ওই উচ্চতম বিন্দু বা টার্মিনাস হল তার সেই আরব্ধ সেই মোক্ষ যেখানে পৌঁছে সে চরিতার্থ হতে চাইছে। এই মোক্ষ মানে একটা টেলস বা একটা উদ্দেশ্যময়তার ধারণা। এটা হেগেলের সমাজবাস্তবতার ছকে আদ্যন্তই রয়েছে। এই টেলস বা মোক্ষ নামক ধারণাটা আছে বলেই ক্রমশঃ সে ওই টার্মিনাসে পৌঁছতে পারে। নয়ত, যাত্রাপথ জুড়ে যে কোনো বিন্দু থেকেই সে ভুলভাল যেকোনো দিকে চলে যেতে পারত। যদি লোকাল ট্রেনগুলো কী লোকাল সেটা না জেনেই আমাদের চড়তে হত তাহলে যেরকম হতে পারত, আমি উঠে বসলাম, জানি না সেটা কী ট্রেন, আমার যাওয়ার কথা বনগাঁ কিন্তু পৌঁছে গেলাম রাণাঘাট।

এই টেলস বা মোক্ষের ধারণার মধ্যে কেলোটা কী লক্ষ্য করুন — কোথায় যাচ্ছি সেটা যাওয়ার আগে থেকেই জানা থাকছে। মানে আর এক ভাষায় 'ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে' গোছের একটা মতাদর্শ। আপনি যখন সমাজ বাস্তবতার একটা নিম্নতর মুহূর্তে রয়েছেন তখনই আপনি কার্যতঃ সমাজবিকাশের উচ্চতম মুহূর্তর দিকে চলেছেন। মানে দাসমালিকেরা আর দাসেরা যখন লড়াই করেছিল তখন এই ক্যাপিটালিজমের পৌঁছনোর চূড়ান্ত লক্ষ্যেই করেছিল, তারা নিজেরা সেটা জানুক আর না জানুক, মানে জানত তো না বটেই, ক্যাপিটালিজম কী তারা সেটা জানবেই বা কী করে, তাদের কাছে তো টাইমমেশিন ছিল না। এবার টাইমমেশিন যদি না থেকে থাকে তাহলে তারা এটা কী করে করছিল? তাদের ঈশ্বর করাচ্ছিলেন? এই কেলোটাই রয়ে যায় টেলস ধারণার মধ্যে। হেগেলে বারবার নানা আকারে দেখছি আমরা ইমানেন্টকে এক্সপ্লিসিট হয়ে উঠতে, উপ্তকে প্রকাশিত হয়ে উঠতে। যদি তা ওঠেই, তার মানে, এক্সপ্লিসিট কোনো এক ভাবে ইমানেন্টের মধ্যেই ছিল। নয়তো তা আসবে কোথা থেকে? দাসরা এবং দাসমালিকেরা কোনো এক ভাবে জানত যে একসময় তাদের নিয়ে স্পার্টাকাস বলে একটা উপন্যাস লেখা হবে এবং সেটা ছেপে পয়সা পেটাবে ক্যাপিটালিস্ট প্রকাশক! ধরুন ঈশ্বর না ভেবে সেখানে একটা যুক্তির শাসন বা র‍্যাশনাল অর্ডারকে আনা যায়। দুনিয়ার বিশ্বপৃথিবীর সবকিছুই সেই র‍্যাশনাল অর্ডারের অধীন, এবং সেই র‍্যাশনাল অর্ডারই বাধ্য

করছে বাস্তবতাকে দাসব্যবস্থা বেয়ে আরো আরো মাধ্যমিক স্তর বেয়ে একসময় তার টার্মিনাসে মানে ক্যাপিটালিজমে পৌঁছতে। সেক্ষেত্রে সমস্যা এটাই যে এই র‍্যাশনাল অর্ডারটা আছে কেন এবং কী ভাবে? কে বাধ্য করল বাস্তবতাকে এই র‍্যাশনাল অর্ডার মানতে? ভাবনার গতিটা দেখুন, একটা কোনো ছক আছে, যা দাসের দাসমালিকের বা অপনার বা আমার বোধের আমাদের সবকিছুর সবার চেয়ে বড়। এই ছকটা কিন্তু প্রকাশিত ভাবে নেই, উপ্ত হয়ে আছে। যত বিবর্তিত হচ্ছে ক্রমে সেই ছকটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। (পুরো মডেলটা দেখুন — ঈশ্বরবিশ্বাসের মডেল। ঈশ্বর আছেন, আমরা টের পাই আর না-পাই, বুঝি আর না-বুঝি। তার ইচ্ছেতেই ঘটছে সবকিছু। দাসমালিকেরাও যা করত তা আসলে মা তারার ইচ্ছেতেই করত। হেগেলের এই আস্তিক জায়গাটা তার ডায়ালেক্টিক্স মারফত মার্ক্সবাদী ঘরানাতেও পৌঁছে গেছিল। কলকাতার মার্ক্সবাদীরা মাঝে দেয়ালে দেয়ালে সন্তানদলের ভগবানের স্লোগানের মত লিখে লিখে ভরিয়ে দিয়েছিল — মার্ক্সবাদ সর্বশক্তিমান কারণ ইহা সত্য।)

আর টেলস থাকা র‍্যাশনাল অর্ডার থাকা মানে একটা গতিবিজ্ঞান বা ডায়নামিক্স-ও থাকা। টেলস বা মোক্ষে পৌঁছতে সমাজবাস্তবতা বাধ্য, তাকে বাধ্য করছে র‍্যাশনাল অর্ডার, তার মানে যে কোনো দিকে যে কোনো ট্রেন আর যেতে পারবে না, বনগাঁ লোকাল বনগাঁতেই যাবে এবং রাণাঘাট লোকাল রাণাঘাটে। এর কোনো নড়চড় নেই। অর্থাৎ, বিভিন্ন অংশগুলোর বোধের ধারণার ক্রিয়ার বাইরে এবং উপরে একটা পূর্বনির্দিষ্ট ছকের উপস্থিতি। একটা অনতিক্রম্য ছক, যা কাজ করে চলেছে স্তর থেকে স্তরে, স্তরগুলোর বোধের অতীত একটা গতিসূত্রে, ডায়নামিক্সে। এই অনতিক্রম্য ছকের উপস্থিতিটাই একটা সারবাদ বা এসেনশিয়ালিজম। ঠিক এসেন্স যেমন কাজ করে চলে অ্যাপিয়ারেন্স-এর দুনিয়ার গভীরে গোপনে, অ্যাপিয়ারেন্স সেটা বুঝুক ছাই না-বুঝুক। এটাই ইতিহাসবাদ বা হিস্টরিসিজম। উত্তরআধুনিকতা এই সমস্ত ছককেই আক্রমণ করে। এসেন্স আর অ্যাপিয়ারেন্সে নিবদ্ধ সমগ্রের ছককে, ক্রমানুসারী স্তরে খচিত সময়ের ছককে। কোনো অনতিক্রম্য ছককেই মানেনা উত্তরআধুনিকতা।

এই র‍্যাশনাল অর্ডার, টেলস, এবং ডিনামিক্স এর ধারণা উপ্ত থাকা হেগেলের সুপারসেশন বা অতিক্রমণ-এর প্রক্রিয়া ইউনিভার্সালের বদলকে বোঝে একটা দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের পদ্ধতি দিয়ে। হেগেলের সমগ্র একটা দ্বান্দ্বিক সমগ্র, যা বদলায় বিবর্তিত হয় এবং ক্রমশঃ স্তরে স্তরে প্রকাশিত হয়। দ্বান্দ্বিক সমগ্র মানে ঐক্য এবং পার্থক্য, ইউনিটি এবং ডিফারেন্স দিয়ে নির্মিত হয় এই সমগ্র।

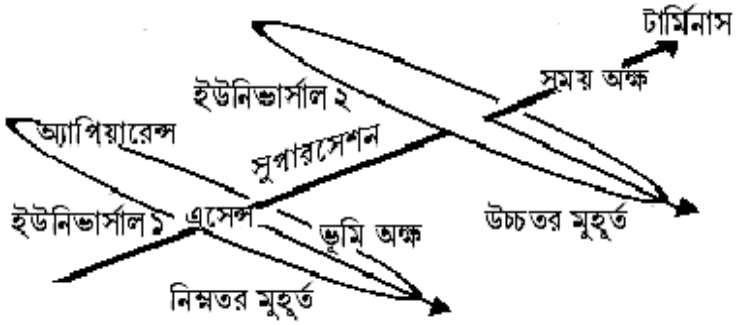

সঙ্গের ছবিতে দেখুন। হেগেলের সমগ্র বা ইউনিভার্সাল-কে এখানে দুটো অক্ষ বরাবর দেখানো হয়েছে। সময় অক্ষ বরাবর সে বদলাতে বদলাতে যাচ্ছে, নিম্নতর মুহূর্ত থেকে উচ্চতর মুহূর্তে। মানে, এখানে একটা সুপারসেশন বা অতিক্রমণ হচ্ছে। ইউনিভার্সাল ১ কে পেরিয়ে আসছে ইউনিভার্সাল ২, উচ্চতর ইউনিভার্সাল। এরকম আরো সুপারসেশন হতে হতে একসময় আসবে উচ্চতম ইউনিভার্সাল বা টার্মিনাস, হেগেল যাকে আইডিয়া বলেও ডেকেছিলেন, মানে আইডিয়াল সমাজের অবস্থা। এতো গেল সময় অক্ষ। প্রতিটি ইউনিভার্সাল কিন্তু তার নিজের ভিতরেই ভূমি অক্ষ বরাবর ছড়িয়ে রয়েছে। সেখানে কেন্দ্রীয় জায়গায় এসেন্স আর তাকে ঘিরে অ্যাপিয়ারেন্সের বস্তুজগত। দ্বন্দ্ব কাজ করছে একটা ইউনিভার্সাল থেকে উচ্চতর ইউনিভার্সালে পৌঁছনোর মধ্যে, গজিয়ে উঠতে থাকা নতুন ইউনিভার্সাল বা থিসিস লড়াই করছে পুরোনো ইউনিভার্সাল মানে অ্যান্টিথিসিসের সঙ্গে, তৈরি হচ্ছে সিন্থেসিস মানে পূর্ণবিকশিত নতুন

ইউনিভার্সাল। আর একটা স্তরে ভূমি অক্ষ জুড়েও দ্বন্দ্ব কাজ করছে। ঐক্য আর পার্থক্যের দ্বন্দ্ব। ইউনিটি এবং ডিফারেন্স-এর ডায়ালেক্টিক্স। ভাববাদী হেগেল শুরু করেন বিশুদ্ধ আইডিয়া থেকে — পিওর বিয়িং। এই পিওর বিয়িং মূর্ত হয়ে ওঠে আমাদের চোখের সামনে বস্তুজগতে। এই বস্তুদের আমরা চিনতে শুরু করি। এই বস্তু ওই বস্তু। এই বস্তুকে নাকচ বা নেগেট করে ওই বস্তু — ওই বস্তু কী, যা এই বস্তু নয়। একজন শিশুর উদাহরণ দিলে বলা যায়, তার নিজের খেলনা নিজের জিনিষ হল এই, আর ওই হল যা তার নিজের নয়। এই বা দিস হল বিয়িং-বাই-সেল্ফ। এবং দ্যাট তার নিগেশন বা বিয়িং-ফর-অ্যানাদার। এবার ধরুন সামনের বস্তুগুলোকে আমরা বুঝতে চাইছি। ধরুন আমাদের সামনে রয়েছে অনেক মানুষ। এই মানুষ থেকে ওই মানুষ আলাদা, ওই মানুষ থেকে আলাদা আর একটা ওই মানুষ ... এভাবে অনন্তকাল ধরে এগোলেও আমাদের চেনার প্রক্রিয়া কিন্তু সম্পূর্ণ হবে না। চিনতে গেলে আমাদের একটা বর্গ লাগবে, একটা নামকরণ। আর, নামকরণ মানেই একটা উত্তরন — একটা লিপ। সামনের সব মানুষদের জন্যে একটা বর্গ তৈরি করলাম — 'মানুষ', যা এই মানুষ ওই মানুষ সব মানুষকেই অন্তর্ভুক্ত করে। তৈরি হল ক্যাটিগরি যা দিস এবং দ্যাট উভয় বস্তুকেই ইনক্লুড করে। যেই বর্গটা পেলাম তখনই এল ওই বর্গের ধর্ম মানে কোয়ালিটি। মনুষ্যত্ব। এবার ওই কোয়ালিটি বা মনুষ্যত্ব আবার আলাদা আলাদা পরিমাণে হাজির আলাদা মানুষে। আমরা আমাদের সামনের মানুষদের আলাদা আলাদা পরিমাণ মনুষ্যত্বের অধিকারী হিশেবে চিনলাম। ধাপে ধাপে দ্বন্দ্বের গতিটা এবার লক্ষ্য করুন। দিসকে নেগেট করে দ্যাট। ডিফারেন্স, বা পার্থক্য — দিস থেকে দ্যাট পৃথক। এই ডিফারেন্স থেকে পেলাম ইউনিটি — দিস এবং দ্যাট-এর সিন্থেসিস পেলাম নেম বা নাম মানে বর্গের নাম, এক্ষেত্রে 'মানুষ'। 'মানুষ' হিশেবে এই মানুষ ওই মানুষ সবাই এক। অর্থাৎ ঐক্য তৈরি হল। এই মানুষ নামক বর্গ থেকে আবার পেলাম বর্গের বিশেষত্ব বা কোয়ালিটি। মনুষ্যত্ব এই ধর্ম আবার মানুষদের ফের আলাদা করল, তৈরি করল ডিফারেন্স।

দিস এবং দ্যাট-এর পরবর্তী সেই ক্যাটিগরি হল বিয়িং-ফর-সেল্ফ, যা দিস বা রিয়ালিটি বা বিয়িং-বাই-সেল্ফ এবং দ্যাট বা নিগেশন বা বিয়িং-ফর-অ্যানাদার — এই দুই বর্গের একটা সংশ্লেষ বা সিন্থেসিস। দিস বা বিয়িং-বাই-সেল্ফ ছিল থিসিস। তাকে নিগেট করল দ্যাট বা বিয়িং-ফর-অ্যানাদার অর্থাৎ অ্যান্টিথিসিস। তৈরি হল বিয়িং-ফর-সেল্ফ বা সিন্থেসিস। এই থিসিস কে অ্যান্টিথিসিসের নিগেট করা, এবং সেখান থেকে সিন্থেসিস-এ পৌঁছনো — এই পুরো পদ্ধতিটার নাম ডায়ালেক্টিকাল পদ্ধতি। ইউনিটি থেকে ডিফারেন্স থেকে ইউনিটি থেকে ডিফারেন্স — হেগেলের (বা পরে মার্ক্স-এর) এই দ্বান্দ্বিক লজিক এইরকম ব্রেকডান্স দিতে দিতে এগোয়। যতক্ষণ না সে তার চূড়ান্ত কেন্দ্র বা এসেন্সে গিয়ে পৌঁছয়, ভূমি অক্ষ বরাবর। একটু পরে আমরা এটায় আবার ফেরত আসছি। (হেগেলের ফিলোজফি অফ রাইট থেকে এই পুরোটার উদাহরণ সহ আলোচনা ২০০১ বইমেলা অপরে অত্যন্ত বিশদ ভাবে করা রয়েছে।)

মানে, আবার আমাদের চিত্রটায় ফেরত যান, ভূমি অক্ষ বরাবর অ্যাপিয়ারেন্স থেকে এসেন্সে পৌঁছনোর ডায়ালেক্টিক্স। এবং সেখানে পুরোটা জুড়েই একটা পূর্বনির্দিষ্ট অনতিক্রম্য ছক। এটাই হেগেলের এসেনশিয়ালিজম। ভূমি অক্ষ জুড়ে যখন ঘটে সেটাকে আমরা ডাকি এসেনশিয়ালিজম বলে, আর সময় অক্ষ জুড়ে ঘটলে তাকে আমরা ডাকি হিস্টরিসিজম। সময় অক্ষ বরাবর বিবর্তনশীল ইউনিভার্সালের সুপারসেশনের ডায়ালেক্টিকস, সুপারসেশন-ই সেই প্রক্রিয়া যার মধ্যে দিয়ে পুরোনো সমাজ সমগ্র তার জটিলতর এবং উচ্চতর মুহূর্তে উন্নীত হয়। প্রতিটি সমগ্র মানে ইউনিভার্সালের প্রতিটি মুহূর্তই কিন্তু আবার তার ভূমি অক্ষ জুড়ে আর একটা দ্বন্দ্বের খেলার মধ্যে রয়েছে। আর এই দ্বন্দ্বের খেলার ভিতরেই অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বয়ে চলেছে তার উচ্চতর ইউনিভার্সালে বিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা এবং সক্ষমতা, পসিবিলিটি এবং পোটেনশিয়াল। যে ওঠানামাহীন ভাঙচুরহীন নিরেট ভারসাম্যের স্থিতাবস্থায় রয়েছে তার তো আর কোনো বদল হতে পারে না। তার মানে, ভূমি অক্ষ বরাবর খেলতে থাকা দ্বন্দ্বের ছোট ছোট কেলো, তারা মিলে মিশে যাচ্ছে, টাইম টু টাইম পাকিয়ে তুলছে এক একটা মেজর কেলো, সময় অক্ষ বরাবর দ্বন্দ্বটাকে বিস্ফোরিত করে তুলছে। মানে একটা সমাজব্যবস্থা বদলে যাচ্ছে আর একটা সমাজব্যবস্থায়, যার আর এক নাম বিপ্লব বা রেভলিউশন। অর্থাৎ, সময় অক্ষ বরাবর দ্বন্দ্ব আর ভূমি অক্ষ বরাবর দ্বন্দ্ব —

এদুটো পরস্পর সম্পর্কিত। তাদের দুজনকে মিলিয়েই হেগেলের এসেনশিয়ালিস্ট সমগ্রধারণার পূর্বনির্দ্ধারিত ছকের ডায়নামিক্স বা গতিবিজ্ঞান।

৪।। ইতিহাসের তত্ত্ব

এই গতিবিজ্ঞানই হেগেলের সরল সাদামাটা আদিম সমগ্রের ইউনিভার্সাল বেচারাকে একের পর এক মুহূর্তের বেড়া টপকানো করাতে করাতে রগদিয়ে আনে উচ্চতম মুহূর্তের আইডিয়ার টার্মিনাস অব্দি। হেগেলের ইউনিভার্সালের এই বিবর্তন একদম নিখুঁত নিয়মের নিগড়ে বাঁধা, অন্য আর পাঁচটা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মত। হেগেলের ইউনিভার্সালের মধ্যে এসেন্স যেমন আছে যা তাকে ওই নির্দিষ্ট স্তরের মুহূর্ত হিশেবে চিহ্নিত করে, আছে নিগেশনের নিগেশন যা বদলের গতিটাকে পয়দা করে, একটা স্তর থেকে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে। ঠিক পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র যেমন, অপ্রশ্নেয়, অপরিবর্তনযোগ্য। সেই অপরিবর্তনীয় আইন মেনেই হেগেলের সমগ্রগুলো নিজের ভিতরেই নিজেকে নাকচ করার, অ্যালিয়েনেট করার, নিজের উচ্চতরকে জায়গা দেওয়ার সম্ভাবনাটাকে গোড়া থেকেই বহন করে। যার জন্যে তাদের আমরা দ্বান্দ্বিক সমগ্র বা কন্ট্রাডি ক্টরি ইউনিভার্সাল বলে ডাকি।

হেগেলের ইতিহাসবিদ্যার এই ডায়ালেক্টিক্স এবং কন্ট্রাডিকশন-এর ধারণা পরে প্রায় হুবহু চলে এসেছিল মার্ক্স-এর ইতিহাস ধারণায়। তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ-এর তত্ত্বে। (প্রায়ই বাংলা প্রবন্ধে ডায়ালেক্টিক্স-এর বাংলা প্রতিশব্দ দ্বন্দ্ব এবং ডায়ালেক্টিকাল-এর প্রতিশব্দ দ্বান্দ্বিক করা হয়, এবং প্রায়ই কন্ট্রাডিকশন আর ডায়ালেক্টিক্স-এর ধারণা গুলিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু কন্ট্রাডিকশন আর ডায়ালেক্টিক্স দুটো আলাদা প্রক্রিয়া, অন্যত্র সে আলোচনা করেছি। এবং এই লেখায় দ্বন্দ্ব বা দ্বান্দ্বিক বলতে সবসময়ই কন্ট্রাডিকশন বা কন্ট্রাডিক্টরি বুঝব।) হেগেলের ডায়ালেক্টিক্স ধারণা দাঁড়িয়ে আছে একটা তেপায়ার উপর, যার কেন্দ্র এসেন্স। এই তিনটে দিক হল, এসেন্সের ঘোষণা বা অ্যাফার্মেশন, এসেন্সের নাকচকরণ বা নিগেশন, এবং সেই নাকচের আবার নাকচকরণ, বা নিগেশন অফ নিগেশন। পুরো প্রক্রিয়াটা বা ডায়ালেক্টিক-টা কিন্তু বিবৃত করছে ওই একেশ্বর এসেন্সকেই। যে এসেন্স বিবর্তিত হচ্ছে এবং নিজেকে হাজির করছে একটা নিম্নতর মুহূর্ত থেকে উচ্চতর মুহূর্তে। এবং এই হাজির করাটা ঘটছে নিম্নতর ওই সরল মুহূর্তের নিজের কাছেই নিজের ফেটে যাওয়া বা অ্যালিয়েনেশনকে ঘিরে। নিম্নতর সরল মুহূর্ত নিজের সঙ্গেই নিজে অ্যালিয়েনেটেড হয়ে যাচ্ছে, দূরবর্তী হয়ে যাচ্ছে এবং জায়গা করে দিচ্ছে ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতার একটা উচ্চতর মুহূর্তকে। কিন্তু এটা ঘটতে পারছে তো শুধুমাত্র এই কারণেই যে ওই অ্যালিয়েনেশনের সম্ভাবনাটা সরল নিম্নতর মুহূর্তের মধ্যে গোড়া থেকেই ছিল। নিজের সঙ্গে নিজে দূরবর্তী এবং অ্যালিয়েনেটেড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা নিজের মধ্যেই রয়ে যাওয়া একেই বলা হয় কন্ট্রাডিক্টরি বা দ্বান্দ্বিক হওয়া, নিজের মধ্যে অন্যকে এনে ফেলার সক্ষমতাটাকে বয়ে চলা।

একটা জায়গায় এই দ্বন্দ্বটা কিন্তু একটা সরল দ্বন্দ্ব, সরাসরি এসেন্স নামক ধনাত্মক বা পজিটিভের নিগেশনের ভিত্তিতে রচিত। এই দ্বন্দ্ব কিন্তু সমগ্রের কোনো ধ্বংসসাধন করে না, তাকে ভেঙে ফেলে না। বরং নিয়ে যায় আর একটা উচ্চতর মুহূর্তের দিকে — যার নাম সুপারসেশন বা অতিক্রমণ। এই সুপারসেশন চিহ্নিত করে আগের সরল মুহূর্তকেই, শুধু একটা নতুন উচ্চতর চেহারায়। রচিত হয় নতুন সমগ্র, তার মানে আবার একটা ঘোষণা বা অ্যাফার্মেশন, আবার তার নাকচ বা নিগেশন, এবং আবার নাকচের নাকচ বা নিগেশন অফ নিগেশন। তার মানে আবার এই নতুন উচ্চতর ঘোষণা বা অ্যাফার্মেশন, প্রথম থেকেই তার মধ্যে বহন করে রাখল নতুন করে ফেটে যাওয়ার, অ্যালিয়েনেশনের সম্ভাবনাটাকে। যার থেকে আসবে একটা আরো নতুন এবং আরো জটিল মুহূর্ত। অর্থাৎ এসেন্স গোড়া থেকেই তার নাকচের নাকচের সম্ভাবনাকে, তার নিজের ফেটে যাওয়ার পূর্বাভাসকে নিজের মধ্যে বহন করে এসেছে। ধনাত্মক এসেন্স তার নিজের ঋণাত্মককে বহন করে এসেছে নিজের ভিতরেই।

লুই আলথুসের তাই এই হেগেলীয় সমগ্রের গতিবিজ্ঞানকে ডেকেছিলেন 'অটো-ডিভলপমেন্ট অফ সিম্পল অরিজিনাল টোটালিটি' — মুল ও আদিম সরল সমগ্রের স্ব-বিবর্তন। প্রতিটি উচ্চতর স্তরেই যোগ হতে থাকে আরো আরো জটিলতা, এই স্ব-বিবর্তনী সমগ্রের ব্যাকরণই হেগেলীয় ডায়ালেক্টিক্স-এর মূল কথা।

হেগেলের তত্ত্বে সমগ্র মানেই একটা দ্বান্দ্বিক সমগ্র, কন্ট্রাডিক্টরি টোটালিটি। যা ইতিহাসের গতিরেখা ধরে ক্রমে বিবর্তিত হয় উন্নীত হয় এবং প্রকাশিত হয়ে ওঠে। ইভলভ করে, ডিভলপ করে এবং আনফোল্ড করে। উচ্চতর মুহূর্তগুলো যার নিম্নতর মুহূর্তগুলোকে অতিক্রম করে আসে, সুপারসিড করে আসে। এই নতুন ক্রমে নির্মিত হতে থাকা উচ্চতর মুহূর্ত হল অ্যান্টিথিসিস, যা পুরোনো মুহূর্তকে মানে থিসিসকে নিশ্চিহ্ন করে এবং থিসিস আর অ্যান্টিথিসিস মিলে জন্ম দেয় সিন্থেসিস-এর, পূর্ণ বিকশিত নতুন মুহূর্ত। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে, চলতেই থাকে, যতক্ষণ নাসার্বজনীন সর্বব্যাপী সত্তা মানে ইউনিভার্সাল স্পিরিট মানে ইতিহাস তার চূড়ান্ত মোক্ষে পৌঁছতে পারে, যার নাম আইডিয়া। যেখানে তার পথের শেষ, টার্মিনাস। এই টার্মিনাসে বা আইডিয়ায় এসে হেগেলের তত্ত্বে ইতিহাসের শেষ, এন্ড অফ হিস্ট্রি।

হেগেলের ইতিহাস ধারণায় স্পষ্ট একটা কর্তা এবং কর্ম আছে। সাবজেক্ট অ্যান্ড অবজেক্ট অফ হিস্ট্রি। এখানে কর্তা বলতে সচেতন বিষয়ী এবং কর্ম বলতে অচেতন বিষয়। সচেতন বিষয়ীর চেতনাটাই চালিকাশক্তি, যার মধ্যে পড়ে 'ওয়ার্ল্ড স্পিরিট' 'বিশ্ব মনন' বা রিজন উইথ এ ক্যাপিটাল আর। (এই রিজনই হল সেই ডিসকোর্স যা আমাদের অন্ধকার থেকে আলোয় এনেছিল, আদিম প্রাকপুঁজির অন্ধকার থেকে আমরা আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলাম, আধুনিকতায় দীক্ষিত আমরা পুঁজির বাজারের রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেছিলাম। এই সর্বব্যাপী সর্বঅতিক্রমী বিষয়ী-চেতনা ঠিক আস্তিক তত্ত্বের ঈশ্বরের ভূমিকা পালন করে, একইরকম ভাবে আমাদের প্রতিটি চেতন অচেতন ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্মাণ করে সকল বোধের উপরে আসীন পরম ব্রহ্মের মত। আমাদের বাস্তবতা-ও নিজের সম্পূর্ণ অগোচরেই পেরিয়ে আসে আদিম সাম্যবাদ দাসব্যবস্থা সামন্ত ইত্যাদি ইত্যাদি পেরিয়ে আসে একসময় পুঁজিতন্ত্রের মোক্ষে চরিতার্থ হবে বলে।) আমরা মনুর সন্তানেরা, মানবেরা হলাম সেই বিশ্ব মননের ধারক, আর আমাদের মানে এই সচেতন বিষয়ী বা কর্তার খেলার জায়গা হল পরমা প্রকৃতি, নেচার। মানব এবং প্রকৃতি — ইতিহাসের এই দুই উপাদান, আর মানবের মাথায় ক্রিয়াশীল ওয়ার্ল্ড স্পিরিট, মাথার গোচরে এবং অগোচরে। খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে হে বিরাট শিশু দ্বন্দ্ব মেনে খেলিছ। প্রকৃতিই তার কর্ম বা বিষয়। হেগেলের ইতিহাসবিদ্যায় এই সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট পারস্পরিকতা বা আন্তঃসম্পর্ক নির্দিষ্ট তিনটি স্তর মেনে ঘটে।

(এক) বিষয়ী মানব যখনো প্রকৃতিরই অংশ। মানব আর প্রকৃতি তখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। সচেতন ক্রিয়ার অর্থে নিষ্ক্রিয় মানব তখনো তাই প্রকৃতিকে চেনেনা। চিনবে কী করে, সে তো নিজেই প্রাকৃতিক। মানব এবং প্রকৃতির তখনো এক অবিচ্ছিন্ন ঐক্য, আনডিফারেনশিয়েটেড ইউনিটি। (দুই) মানব ক্রমে সচেতন হয় যে নিতান্তই প্রকৃতি নয়, কিন্তু প্রকৃতিকে তখনো সে নিয়ন্ত্রণ-ও করতে পারে না। প্রকৃতিকে সে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে চিনতে শিখল। এইসময় মানব ও প্রকৃতির মধ্যের অবস্থাটা একটা বিচ্ছিন্ন অনৈক্য, ডিফারেনশিয়েটেড ডিজইউনিটি। (তিন) মানব ক্রমে বুঝল যে সে প্রকৃতি থেকে আলাদা এবং প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে চিনল এবং জানল, অর্থাৎ, তার প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া শুরু হল — চেনা এবং জানাটা তো কখনো নিষ্ক্রিয় হয় না। প্রকৃতি ও মানবের তখন বিচ্ছিন্ন ঐক্য, ডিফারেনশিয়েটেড ইউনিটি।

লক্ষ্য করুন, হেগেলের এই পুরো স্তরবিন্যাসটা জুড়ে মানবের চালিকা শক্তি সেই মানব-অতিক্রমী চেতনা, বিশ্ব মনন, ওয়ার্ল্ড স্পিরিট। কেন সেই অধম বেচারা আদিম মানব তার নিজের মুন্ডের অগোচরেই নিজেরই মুন্ডের ভিতরে এই চেতনাকে বহন করতে শুরু করল তার কিন্তু কোনো উত্তর নেই — কেন এমন সব ক্রিয়া শুরু করল যার কারণ সে জানতে পারবে তার এই ইতিহাসযাত্রার শেষবিন্দুতে ইতিহাসের টার্মিনাসে পৌঁছে? অথচ এই ক্রিয়াগুলোই তাকে একটু একটু করে এগিয়ে দেবে তার চূড়ান্ত মোক্ষের দিকে। সেই আদিম মানব তো নিজের শরীর নিজের হাত পা খিদে যৌনতা ছাড়া কিছু জানত না, কিন্তু তার নিয়তিতে গোপনে কাজ করে চলেছিল একটা বিশ্ব, নইলে সে বিশ্ব মননের ধারক হবে কী করে?

মানবের ওই বিশ্ব মনন বা ওয়ার্ল্ড স্পিরিট যদি ইতিহাসের গতিশীলতার সার বা এসেন্স হয় তাহলে প্রাথমিক ভাবে তাকে নাকচ বা নিগেট করে তার নেগেটিভ বা তার অ্যাপিয়ারেন্স — নেচার বা প্রকৃতি। ইতিহাস এগোয় একটা স্তর থেকে আর একটা স্তরে এই ডায়ালেক্টিক্স-এর প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে। প্রক্রিয়াটা

শুরু হয় অবিচ্ছিন্ন ঐক্য বা আনডিফারেনশিয়েটেড ইউনিটি থেকে — মানে, সেই ঘোষণা বা অ্যাফারমেশন। সেখান থেকে শুরু করে ইতিহাস এবার সেই প্রাথমিক ঐক্যকে নাকচ করে বিচ্ছিন্ন অনৈক্য বা ডিফারেনশিয়েটেড ডিজইউনিটি দিয়ে। এই বিচ্ছিন্ন ঐক্য আবার নাকচ হয় বিচ্ছিন্ন ঐক্য বা ডিফারেনশিয়েটেড ইউনিটি দিয়ে। এই গতিবিজ্ঞান তাই নিয়ন্ত্রিত হয় হেগেলের সেই তেপয়া বা ট্রায়াড দিয়ে — অ্যাফারমেশন, নিগেশন, নিগেশন অফ নিগেশন। এবং, প্রত্যেক স্তরেই মানব এবং তার বিশ্ব মনন বা ওয়ার্ল্ড স্পিরিট তার দ্বান্দ্বিক বা কন্ট্রাডিক্টরি অপর, মানে প্রকৃতির মুখোমুখি হয়। এই আদারের সঙ্গে তার মুখোমুখি সাক্ষাত তাকে এগিয়ে দেয় এর পরের উচ্চতর স্তরের দিকে — যেখানে সে আবার এই দ্বন্দ্বকে পাবে, আর একটা চেহারায়, উচ্চতর এবং জটিলতর। প্রতিটি স্তরে প্রকৃতি নামক তার আদার বা অপরের সঙ্গে এই মুখোমুখি দ্বৈরথের মধ্যে দিয়ে ওয়ার্ল্ড স্পিরিট-ও ক্রমশঃ বিবর্তিত বিকশিত পরিবর্তিত উন্নীত হতে থাকে। এই মুখোমুখি দ্বন্দ্বের দ্বৈরথ চলতেই থাকে, চলতেই থাকে যতক্ষণ না ওয়ার্ল্ড স্পিরিট তার উচ্চতম স্তরে পৌঁছে গেছে, যেখানে সে অতিক্রম করে গেছে তার সমস্ত দ্বন্দ্বকে, পৌঁছে গেছে তার প্রকৃত সত্তায়। মাটির পৃথিবীতে যতক্ষণ না সাম্যের ঈশ্বর হাঁটছে, যতক্ষণ না এই পৃথিবীই সেই স্বর্গ যার স্বপ্ন দেখেছিল দাস তার অসুখী চৈতন্যে, আনহ্যাপি কনশাসনেসে।

কিন্তু, লক্ষ্য করুন এই ইতিহাস বা সময়রেখা কখনোই তো ঘড়ির কাঁটার সময়রেখা হতে পারে না, ঘড়ির কাঁটার সময়ে তো প্রতিটি মুহূর্ত কোনো বিশেষ ঘটনা পরম্পরা কোনো বিশেষ পরিবর্তন ব্যতিরেকেই, এমনিতেই তার পরের মুহূর্তের দ্বারা অতিক্রান্ত হয়। প্রতিটি পরবর্তী সেকেন্ড তার অগ্রবর্তী সেকেন্ডের মৃত্যু এমনিতেই ঘোষণা করে। বিশেষ কোনো গতিবিজ্ঞান তার জন্যে আদৌ দরকার পড়ে না। যা হেগেলের এই ইতিহাসের বা সময়ের পড়ে, যেখানে প্রতিটি পরবর্তী মুহূর্ত তার অগ্রবর্তী মুহূর্তকে অতিক্রম করে যেতে পারে একটা বিবর্তনের আমূল বদলের নিগেশন অফ নিগেশনের মধ্যে দিয়ে। তার মানে ঘড়ির কাঁটায় কন্টকিত এই ক্রোনলজিকাল সময় থেকে পৃথক ওই সময় বা ইতিহাসকে বোঝার জন্যে, ওই ইতিহাসের গতিকে ধরার জন্যে আর একটা বিজ্ঞান লাগবে যা বানানোর দায়িত্ব-ও পড়ছে এই ইতিহাসের প্রস্তাবক হেগেলেরই উপর। এই বিজ্ঞানটার নামই হেগেলের লজিক। এই লেখার সেকশন দুই-এ একটু উল্লেখ করেই ছেড়ে দিয়েছিলাম, এবার সেই লজিকটা আমরা আর একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব, আমাদের অবলুপ্ত প্রাকৃত-এর পুনর্বাসনের স্বার্থে।

৫।। ডকট্রিন অফ বিয়িং

আমরা এই হেগেলের লজিকটা পড়তে যাচ্ছি কোনো বিশুদ্ধ হেগেলতার স্বার্থে না, আমাদের খুব ফাইনাইট একটা গোল আছে, আমরা মার্ক্স-এর তত্ত্বের শ্রমিকশ্রেণীকে, তার বাস্তবতাকে খুঁজে পেতে চাইছি একটা উত্তরআধুনিক পৃথিবীতে। তাই আমরা হেগেলের 'ফিলোজফি অফ রাইট' আর মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' পাশাপাশি রেখে পড়তে চাই, মিলিয়ে মিলিয়ে। হেগেলকে এইভাবে পড়ার মধ্যে একটা গন্ডগোল রয়ে যাবে, একটা ডিসটরশন রয়ে যাবে, আদত হেগেল পাঠ করা আর হবে-না, তবে প্রথমতঃ, সেই আদত হেগেল দিয়ে আমাদের কী হবে, আমরা খাব না মাথায় দেব? আর দ্বিতীয়তঃ, অতিনির্ণয়ে সব কিছু ঘেঁটেঘুঁটে যাওয়া এই বাস্তবতা নামক চচ্চড়িতে 'আদত' বলে আর আদৌ কিছু হয় কিনা তাই তো আর আমরা জানিনা (অনেকেই কিন্তু জানে, মনে রাখবেন)। আমরা মার্ক্স-বোঝা দিয়ে, মানে মার্ক্স-এর আলোয় হেগেলকে আলোকিত করছি, যাতে, ফাইনালি, আমরা মার্ক্স-এর একটা হেগেলীয় পাঠে পৌঁছতে পারি।

তাই, আমাদের এই ডেলিবারেটলি বিকৃত হেগেল পাঠ আমরা শুরু করছি ডিটারমিনেট বিয়িং থেকে। আগে যেমন বলেছি, ভাববাদী হেগেল শুরু করেন বিশুদ্ধ অস্তি বা পিওর বিয়িং বা ইজনেস থেকে, যা একটা আইডিয়া মানে ভাবনা। আমরা বরং সম্মুখস্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা ডিটারমিনেট বিয়িং থেকে শুরু করি, আমাদের আশু মার্ক্সপাঠকে মাথায় রেখে। মানে, প্রথমেই আমরা হেগেলের যাত্রাশুরুর দার্শনিক বর্গ 'বিয়িং', 'বিকামিং', এবং 'নাথিং'-কে বাদ দিয়ে অন্য জায়গা থেকে শুরু করলাম। যেমন বলেছি হেগেলের যুক্তিবিজ্ঞানের, লজিকের মূল ধরতাইটা হল, ঐক্য আর পার্থক্য, ইউনিটি আর ডিফারেন্স। আমরা প্রথমে

একটা ইউনিটি থেকে শুরু করে একটা ডিফারেন্স-এ পৌঁছব, সেখান থেকে ফের ইউনিটি, ফের ডিফারেন্স ...। প্রথম ইউনিটির থেকে দ্বিতীয় ইউনিটি উচ্চতর, দ্বিতীয়র থেকে তৃতীয়, তৃতীয়র থেকে ... ইত্যাদি। এই ধ্রুবপদটা আমরা গাইতেই থাকব, গাইতেই থাকব, যতক্ষণ না সেই টার্মিনাস বা আইডিয়ায় পৌঁছই (হেগেল ছিলেন ভাববাদী, তাই তিনি শুরু-ও করেছিলেন ইজনেস মানে আইডিয়ায়, শেষ-ও করেছিলেন আইডিয়ায়) । আইডিয়া মানে একেবারে নিশ্চিন্দিপুর, হাত-পা ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত, আর কোনো বদলের কোনো সিন-ই নেই। ইউনিটি আর ডিফারেন্সের ওই খেল খতম, জার্নি খতম, হেগেলের লজিক-ও খতম। মানে, আমাদের জার্নিটা দাঁড়াল অনেকটা এইরকম —

ঐক্য → পার্থক্য → ঐক্য → ... → পার্থক্য → ঐক্য → পার্থক্য → আইডিয়া হেগেলের চিন্তাপ্রক্রিয়াটা ভাবুন — হেগেল এই পৃথিবী এই বাস্তবতাটাকে ব্যাখ্যা করতে চাইছেন, আর, যে পৃথিবী নেই তাকে তো ব্যাখ্যা করা যায় না, তাই, তাকে প্রথমেই ধরে নিতে হবে পৃথিবীটা আছে। আছে — ইজ — বিয়িং।

এই 'ইজ' বা 'আছে' থেকে আলোচনা শুরু করার একটা অন্য বাধ্যতাও আছে, যে সমস্যাটায় ভাষা চিন্তাপ্রক্রিয়া আর বাস্তবতা একই সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। যেকোনো একটা তত্ত্বের শুরুর বিন্দু বা পয়েন্ট অফ ডিপার্চার হল সেই জায়গাটা যার পর থেকে ওই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে, কিন্তু যে শুরুর বিন্দুকে কখনো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে না, শুরুর বিন্দুটাকে ধরে প্রদত্ত এবং অপ্রশ্নেয়। যেমন ধরুন সমাজবিজ্ঞানে বা মানববিদ্যায় ভাষার উদ্ভবটা অনেক ক্ষেত্রেই এই পয়েন্ট অফ ডিপার্চার। এর আগেরটা, মানে ভাষার উদ্ভবটা কী করে ঘটল সেটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয় না। অঙ্কে বা বিজ্ঞানে আমরা যে স্বতঃসিদ্ধ বা অ্যাকশিওম গুলো নিই সেগুলোকে পয়েন্ট অফ ডিপার্চার বলা যায়। এবার এই 'আছে' বা 'ইজ' বা 'বিয়িং'-কে পয়েন্ট অফ ডিপার্চার হিশেবে নেওয়ার গল্পটার মধ্যে আর একটা বড় কেলো রয়ে যায়। 'ইজ' শব্দটাকে ভাবুন, আপনি ব্যাখ্যা করতে চাইছেন, তাহলে আপনাকে একটা সংজ্ঞা দিতে হবে, 'ইজ' নামক বর্গ বা ধারণা বা ঘটনাটাকে ব্যাখ্যা করতে হলে আপনাকে কোনো বাক্য বলতে বা লিখতে হবে। আপনি এমন কোনো বাক্য লিখতে পারবেন যাতে 'ইজ' নামক শব্দটা তার কোনো না কোনো অবয়বে নেই? পারবেন না। বাংলায় নয় 'আছে' এই শব্দটা, বা 'হওয়া' নামক ক্রিয়াটা বাক্যের ওরকম অপরিহার্য অংশ নয়, কিন্তু ধারণাটাকে বাদ দিয়ে আপনি একটা ক্ষুদ্রতম বিবৃতিও ভেবে উঠতে পারবেন না। অর্থাৎ 'ইজ' এর যে কোনো ব্যাখ্যার মধ্যে 'ইজ' ইতিমধ্যেই সদাসর্বদাই রয়ে গেছে, মানে 'ইজ' হয়ে আছে। এরকম আনইজি হবেন না, ব্যাপারটা ঠিক এরকমই, যার জন্যে পৃথিবীর প্রতিটি দার্শনিককে বাধ্যতামূলক ভাবে এই 'বিয়িং' নামক ধারণার ব্যাখ্যা করার চেষ্টাটা পরিত্যাগ করতে হয়েছে। মানে, শুরু করতে হয়েছে 'বিয়িং' থেকে, ওটুকুকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে। এই ভাষা-বিয়িং-চিন্তার কেলোটা নিয়ে চমৎকার আলোচনা আছে উমবের্তো একোর 'কান্ট অ্যান্ড দি প্ল্যাটিপাস' বইয়ে। একো তো একেবারেই বোর নয়, পড়ে খুব আমোদ পাবেন।

এই 'আছে' বা 'ইজ' থেকেই তাই শুরু করলেন হেগেল। কিন্তু কিছু একটা 'আছে' বলে ধরে নিলে সঙ্গে সঙ্গে একটা 'আছে-ত্ব' থাকে, বা 'ইজ-নেস', মানে একটা ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি বা অবস্থা — যা সত্যি হলে কোনো একটা বস্তু বা সত্তা 'ইজ' বা 'আছে' হয়ে ওঠে। এবং দেখুন, এই 'ইজ-নেস' বা 'আছে-ত্ব'-টা একটা নোশন বা ধারণা। এই খান থেকে হেগেলের শুরু, সেই জন্যেই আমরা বলেছিলাম ভাববাদী হেগেল শুরু করেছেন একটা ভাব বা আইডিয়া থেকে। 'আছে-ত্ব'-র এই ধারণাটা কিন্তু বস্তুজগতের সমস্ত পিছুটান থেকে মুক্ত, একটা বিশুদ্ধ ধারণা, কারণ শুধুমাত্র 'আছে' হওয়ার ধর্মটাকে ভাবছি আমরা, কী আছে সেটা না ভেবেই। কিন্তু 'ইজ-নেস' বা 'আছে-ত্ব'-র এই বিশুদ্ধতাটা আর ধারণাটার শূন্যতাকেও চিহ্নিত করে। কী আছে যতক্ষণ না বলছি, 'আছে' এই পুরো ব্যাপারটা শূন্য, ফাঁপা, ভয়েড, কিছু-না। এই শূন্য ভয়েড কিছু-না বিয়িং থেকে একটা কিছু পাওয়ার জন্যে আমাদের এই বিশুদ্ধ শূন্য ফাঁপা বিয়িং-কে নাকচ বা নিগেট করতে হবে। কিন্তু যে কোনো কিছুকে নাকচ বা নিগেট করতে গেলে তার ঠিক বিপরীত ধারণাটা আমাদের প্রয়োজন পড়ে। এক্ষেত্রে বিয়িং এর সেই বিপরীত বা নেগেটিভ ধারণাটা হল নাথিং বা নাস্তি। ওই পিওর বিয়িং বা বিশুদ্ধ অস্তিকে, ফাঁপা শূন্য কিছু-না ওই 'আছে-ত্ব'-র ধারণাকে নিগেট করে আমরা পাই কিছু বা সামথিং বা ডিটারমিনেট বিয়িং। আমাদের সামনের বস্তুজগতের বস্তু ও সত্তাদের, যারা ডিটারমিনেট, ইন্দ্রিয়

দ্বারা নির্ণীত ও বোধযোগ্য। তার মানে এবার আমাদের হাতে এল পরপর দুটো দার্শনিক বর্গ — বিয়িং, এবং নাথিং। তারপর পিওর বিয়িং-কে নিগেট করে পেলাম ডিটারমিনেট বিয়িং। অর্থাৎ, পিওর বিয়িং হয়ে উঠল ডিটারমিনেট বিয়িং। এই হয়ে ওঠা বা বিকামিং-ই আমাদের তৃতীয় হেগেলীয় বর্গ।

হেগেলের লজিকের প্রস্তাবনার তিনটে দার্শনিক বর্গই আমরা পেয়ে এলাম, বিয়িং, বিকামিং, নাথিং। এই জায়গাটায় একটু খটোমটো লাগতে পারে, কিন্তু কিছু করার নেই, হেগেলের দর্শনের পদ্ধতি ঠিক এই ভাবেই এগিয়েছে। আমাদের কাছে আরো বিদঘুটে লাগে এইজন্যে যে আর একভাবে ভাবলে এই পুরোটা বাদ দিয়েই কাজ চালানো যায়। যদি পিওর বিয়িং বা বিশুদ্ধ অস্তির এই কূট প্রশ্ন ছেড়ে আমরা আমাদের সামনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ডিটারমিনেট বিয়িং থেকেই শুরু করি। আমরা তো হেগেলের মত কূট তাত্ত্বিক নই যে আমাদের বিশুদ্ধ ধারণা পিওর বিয়িং থেকে শুরু করে, নাথিং দিয়ে তাকে নাকচ করে তবে সামথিং-কে পেতে হবে। আমরা তো তাদের পেয়েই বসে আছি, বা, তাদেরই পেয়ে বসে আছি, আমাদের সম্মুখস্থ বাস্তবতার পৃথিবীতে। (তারা আমাদের পেয়ে বসেছে এরকমটাও বলা যায় বোধহয়।) তাই হেগেলের এই শুরুর জায়গা, এই নির্মিত ঐক্য বা কন্সট্রাকটেড ইউনিটি মানে পিওর বিয়িং-কে বাদ দিয়ে, আসুন আমরা শুরু করি আমাদের সম্মুখস্থ পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগত থেকে। সেখানে আমরা দেখছি ঐক্য না, পার্থক্য, এক না অনেক বস্তু, অনেক ডিটারমিনেট বিয়িং। এই ডিটারমিনেট বিয়িং বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা আর কিছুই না, যার মধ্যে আমি বিয়িং বা অস্তিকে কিছু নির্দিষ্ট গুণে এবং বৈশিষ্ট্যে পাচ্ছি, তাদের বুঝতে পারছি, অনুভব করতে পারছি, মাপতে পারছি। ধরুন আকৃতি বা ওজন বা রং বা উষ্ণতার তারতম্য। গুণগত সেই বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক ডিটারমিনেট বিয়িং থেকে অন্য প্রত্যেক ডিটারমিনেট বিয়িং-এ আলাদা, ইনফ্যাক্ট সেই জন্যেই তারা আলাদা।

একটা ডিটারমিনেট বিয়িং-কে চেনা বা বোঝা মানে একই সাথে দুটো জিনিষকে বোঝা — সে কী, এবং সে কী নয়। ধরুন আপনি এই মুহূর্তে এই লেখাটা পড়ছেন, পত্রিকার এই সংখ্যাটা। আপনার সামনে আনলেই আপনি এটাকে চিনতে পারবেন, তার মানেই, অন্য কিছু আনলে আপনি চিনতে পারবেন যে সেটা এই জিনিষটা নয়। অর্থাৎ, একটা নির্দিষ্ট ডিটারমিনেট বিয়িং-কে চিনতে গিয়ে আমাদের দুটো জিনিষ দরকার পড়ল। এক, সে কী, মানে তার রিয়ালিটি বা বিয়িং-বাই-সেল্ফ। এবং, দুই, সে কী নয়, মানে তার নিগেশন বা বিয়িং-ফর-অ্যানাদার। আমরা বিশুদ্ধ অস্তি বা পিওর বিয়িং-কে না-বুঝে তার জায়গায় ডিটারমিনেট বিয়িং-কে বুঝছি, বিয়িং কে বুঝছি সামথিং দিয়ে, 'আছে'-কে বুঝছি 'কিছু আছে' দিয়ে। এই কিছুটা একটা নির্দিষ্ট কিছু, যা এইটা বা দিস, এবং ওইটা বা দ্যাট নয়। তার মানে আমরা দুই সেট বর্গ পেলাম। এক, রিয়ালিটি, বিয়িং-বাই-সেল্ফ, দিস। এবং, দুই, নিগেশন, বিয়িং-ফর-অ্যানাদার, দ্যাট। এটা এবং ওটা, সবকটাকে মিলিয়েই আমরা দেখছি এখন, এক নয় অনেক বস্তু বা সত্তাকে। যারা আপাতদৃষ্টিতে এ অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং আলাদা, স্বতন্ত্র সত্তা। তার মানে, গোড়াতেই আমাদের সঙ্গে হেগেলের একটা বড় প্রভেদ ঘটে গেল। হেগেল শুরু করেছিলেন বিশুদ্ধ অস্তি বা পিওর বিয়িং থেকে — যা এক, ওয়ান। একটা ঐক্য বা ইউনিটি-বাচক ধারণা, একটা বিশুদ্ধ ভাব যা এই অস্তি ওই অস্তি সব অস্তিকেই ধারণ করে। সেখানে আমাদের শুরুর জায়গাটা ঐক্য নয়, পার্থক্য। এক নয়, অনেক। আমরা সম্মুখস্থ বস্তুজগতের অনেক ডিটারমিনেট বিয়িং মানে তাদের পারস্পরিক পার্থক্য বা ডিফারেন্স থেকে।

এবার এই অনেক বস্তুকে আমাদের একত্র করতে হবে, ঐক্যবদ্ধ। 'অনেক'-কে 'এক'-এ আনতে গিয়ে একটা ঐক্যের নীতি বা ইউনিফাইং প্রিন্সিপল খুঁজতে হবে। যাতে আমরা এই বিয়িং এবং ওই বিয়িং-কে, দিস এবং দ্যাট-কে একটা বৃহত্তর বিয়িং-এর দুটো মুহূর্ত বলে ভাবতে পারি। টেকনিকাল শব্দে বলতে গেলে আমরা এবার আনতে চাইছি একটা স্বনিয়ন্ত্রিত সত্তা বা সেল্ফ ডিটারমিন্ড বিয়িং-কে। এই সেল্ফ ডিটারমিন্ড বিয়িং বা বিয়িং-ফর-সেল্ফ এমনই একটা বর্গ যার রিয়ালিটি নিজেই তার নিগেশনকে অন্তর্ভুক্ত করে আছে। দিস বা রিয়ালিটি বা বিয়িং-বাই-সেল্ফ এবং দ্যাট বা নিগেশন বা বিয়িং-ফর-অ্যানাদারকে একত্রিত করে তৈরি হয়েছে এই নতুন বর্গ বিয়িং-ফর-সেল্ফ। এই বিয়িং-ফর-সেল্ফ হল সেই ঐক্যবদ্ধতার নীতির ভিত্তি। বা

হেগেলের দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ বর্গ 'ওয়ান'। এই এক-এর ভিতরে এবার সম্মুখস্থ ওই অনেক সত্তা ঐক্যবদ্ধ হয়, একত্রিত হয়, তাদের নিজেদের পারস্পরিক সমস্ত গুণগত পার্থক্য নিয়েই।

এক-এর এই উৎস থেকে এই ওই সমস্ত ডিটারমিনেট বিয়িং-রা প্রবাহিত হচ্ছে, অনেক-এর আকারে। ওয়ান থেকে আমরা মেনি পাচ্ছি, গুণগতভাবে পৃথকের পরিমাণগত মেনি। তারা প্রত্যেকে অন্য প্রত্যেকের থেকে গুণগতভাবে কোয়ালিটেটিভলি পৃথক। প্রত্যেকের থেকে প্রত্যেকের এই গুণগত পার্থক্য তাদের একটা সংখ্যাগত বহু, পরিমাণগত বহু, কোয়ান্টিটেটিভ মেনি-র দিকে ঠেলে দেয়। এই পত্রিকার একটা লেখা প্রবন্ধ, অন্য একটা পদ্য, তারা ১ থেকে ২ হল, এই আর একটা গল্প, তারা এবার ৩, কারণ, পদ্য প্রবন্ধ গল্প এরা গুণগত ভাবে আলাদা। ইত্যাদি। এক, অনেক — ওয়ান, মেনি — হেগেলের দর্শনের যুক্তিবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো বর্গ। মূল বিষয়টা এখানে এই যে, যে বাস্তবতায় আমরা বসবাস করি সেখানে অনেক অনেক সত্তা, তাদের বিপরীতদের নিয়েই, তাদের সমস্ত পার্থক্য নিয়েই, একটা ঐক্যের মধ্যে একত্রিত রয়েছে। হেগেলের দর্শন সেই বৈপরীত্য বিরোধ সবকিছুকে নিজের মধ্যে ধরে রাখা এই দ্বান্দ্বিক ঐক্য বা কন্ট্রাডিক্টরি ইউনিটিকে ধরতে চাইছে। এবং বাস্তবতার বিভিন্ন স্তরে সেই দ্বান্দ্বিক ঐক্যের ফলাফলগুলো কী হয় সেটাই বুঝতে চাইছে হেগেলের লজিক। হেগেলের 'ডকট্রিন অফ বিয়িং'-এ আমরা এই ইউনিটিকে বুঝি 'ওয়ান'-এর আকারে, যা আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় উপস্থিত হয় অ্যাপিয়ার করে 'মেনি'-র আকারে। ওয়ান হল ঐক্য, এবং মেনি তাদের পার্থক্য, অনেক সংখ্যক পরিমাণগত বহু, কোয়ান্টিটেটিভলি মেনি।

এবার এই পরিমাণগত বহু, কোয়ান্টিটেটিভলি মেনিকে আমাদের আনতে হবে একটা হোমোজিনিয়াস বা সমস্বত্ত্ব তলে। যাতে তাদের তুলনায় আনা যায়। যেমন হাতি আর ঘোড়াকে তুলনা করা যায় না, কারণ তারা গুণগতভাবে আলাদা, কোয়ালিটেটিভলি ডিফারেন্ট, হাতির গুণ হাতিত্ব আর ঘোড়ার গুণ ঘোড়াত্ব। কিন্তু যেই তাদের দৌড়বীর হিশেবে ভাবলাম, 'দৌড়তে পারা' নামক সমস্বত্ত্ব তলে নিয়ে এলাম, তখনি তাদের তুলনা করতে পারব, ঘোড়া দৌড়তে পারে হাতির চেয়ে দ্রুত, দৌড়বীর ঘোড়া হাতির চেয়ে উপরে যেমন ওজনদার হওয়ার নিরিখে হাতি ছিল ঘোড়ার উপরে। এই সমস্বত্ত্বতার তল, হোমোজেনেইটির প্লেন এবার ওই মেনি-কে আবার ওয়ান করবে। সমস্বত্ত্বতার প্রকৃতির সাপেক্ষে গুণগতভাবে ওয়ান, দৌড়বীর নামক গুণের নিরিখে ওয়ান, বা ওজনদার হওয়ার গুণের সাপেক্ষে ওয়ান। ওই কোয়ান্টিটেটিভলি মেনি, পরিমাণগত ভাবে বহু আবার গুণগতভাবে এক হবে। দৌড়বীর হিসেবে সমস্বত্ত্বতার ধর্ম যেমন আপামর জীবজন্তুকে নিয়ে একটা ক্রম বা হায়েরার্কি সৃষ্টি করেছিল যে তালিকায় উচ্চতম ধাপে ছিল চিতা, কিছুটা নিচে ঘোড়া, তার আবার অনেকটা নিচে হাতি, তারও বহু নিচে মানুষ, ঠিক সেইরকম, সংখ্যা বা পরিমাণের মাপে বহু ওই মেনিকে এই সমস্বত্ত্ব তলে নিয়ে আসা মাত্র তাদের নিয়ে একটা অর্ডারড স্পেস বা ক্রমবিভক্ত ভূমি তৈরি হল, যে ক্রমবিভক্ত ভূমিতে তারা এক এক জন একটা ধাপে রয়েছে, কেউ উপরে কেউ নিচে। সমস্বত্ত্বটার এই নিরিখটা আবার দুই রকম হতে পারে, কার্ডিনাল আর অর্ডিনাল।

কার্ডিনাল আর অর্ডিনাল-এর তফাতটা খুব ভালো বোঝা যায় 'হামসে হ্যায় মুকাবলা' সিনেমায় নাগমাকে প্রভুদেবার প্রেমনিবেদনের এসপির গলায় একটা গাওয়া একটা গান দিয়ে। "ফুলমালা দো রুপাইয়া, তেরে জুলফো মে সাজাও ফুল স রুপাইয়া/ যো মিঠাই এক রুপাইয়া — তু মুহ লাগাকে মুঝকো দে তো লাখ রুপাইয়া"। এই অব্দি খুব ক্লিয়ার যে বাজারের ভিজে ভিজে জল ছেটানো ফুলের মালা নাগমা যেই নিজের চুলে সাজাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর কাছে তারা ম্যাজিক হয়ে যাচ্ছে, কিম্বা শালপাতায় করে শোকেসের উপর ঠক করে নামিয়ে রাখা একটা প্যাঁড়া আমূল বদলে যাচ্ছে যখনি নাগমা সেই মিষ্টি নিজের ছটাছটি-হাস-দশনে আলতো একটু ঠুকরে দিচ্ছে। কিন্তু ওই দামটা কে মাপল, প্রভু? ওই ম্যাজিকমালা বা প্রেমপ্যাঁড়া তখন সে বেচে দেখেছে বাজারে, এক স রুপাইয়া বা এক লাখ রুপাইয়াতে? না, এখানে স আর লাখের জায়গায় হাজার বা কোটিও একইরকম অর্থ তৈরি করত। মানে, ম্যাজিকমালা নিশ্চিত ভাবেই আবেগের মাপে নর্মাল মালার চেয়ে উপরে। বা এঁটো প্যাঁড়াও তাই। কিন্তু ওই মাপগুলো নিতান্তই কথার কথা, প্রেমের প্রথম দুআড়াই মাসে মানুষ ওরকম বলে থাকে। ইউটিলিটি বা উপযোগিতার নিরিখে বললে, ম্যাজিকমালার উপযোগিতা এমনি মালার চেয়ে বেশি, কিন্তু কতটা বেশি তা কখনোই বলা যাবে না। কিন্তু ঘেঁটু ফুলের

মালার চেয়ে একটা সোনার মালা দামের নিরিখে ঠিক কতটা উপরে তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। তাই, প্রথম ক্ষেত্রে, মানে যেখানে কতটা তফাত মাপতে পারছি না, কিন্তু উপরে না নিচে এই অর্ডারটা বলতে পারছি সেটাকে বলা হয় অর্ডিনাল। আর যখন ওই তফাতটাও অঙ্কে বা পরিমাণে মাপতে পারছি সেটাকে বলা হয় কার্ডিনাল।

আমাদের ওই সংখ্যাগতভাবে বহু মেনিকে আমরা যেই সমস্বত্ত্বতার তলে এক বা ওয়ান করলাম, তাদের মধ্যে একটা র‍্যাঙ্ক বা অর্ডার সৃষ্টি হল, যা কার্ডিনাল বা অর্ডিনাল দুই-ই হতে পারে। যেমন দৌড় বা ওজনের জায়গায় যদি আমরা বুদ্ধিকে ওই সমস্বত্ত্বতার নিরিখ করতাম, তাহলে আবারো র‍্যাঙ্ক বা ক্রমটা থাকত, যেমন ঘোড়া বা কুকুর অন্য পোষ্যদের চেয়ে বুদ্ধির মাপে উপরে, কিন্তু কতটা উপরে তা আর বলা যেত না। দৌড় বা ওজনের কার্ডিনাল ক্রম এক্ষেত্রে হত অর্ডিনাল। এই কার্ডিনাল বা অর্ডিনাল ক্রমে এবার ওই বহু ডিটারমিনেট বিয়িং নিপাট বিন্যস্ত হয়ে গেল, এ এক, ও দুই, ও তিন ইত্যাদি। অর্থাৎ, ওই ক্রমের মধ্যেই একটা পরিমাপ বা মেজারের ধারণা উপ্ত হয়ে আছে। একটা স্কেল যেন। এই মেজার বা পরিমাপ-টাকে ভাবুন, এর মধ্যে একই সঙ্গে কোয়ালিটি আর কোয়ান্টিটি, গুণ আর পরিমাণ, দুই-ই কাজ করছে। একটা গুণের পরিমাণ। ধরুন দৈর্ঘ নামক গুণ আঙ্গুল থেকে লাঙ্গুলে বেশি, স্কেল দিয়ে আপনি পরিমাপ করলেন, আপনার আঙ্গুল আড়াই ইঞ্চি, আর লাঙ্গুল?

৬।। থিং গ্রাউন্ড ইউনিভার্সাল

আগের এপিসোডের রিক্যাপ দিই আসুন। বিশুদ্ধ অস্তি, পিওর বিয়িং — ইউনিটি। তার থেকে গজিয়ে উঠছে পার্থক্য, ডিফারেন্স। নির্মিত হচ্ছে দিস (বিয়িং-বাই-সেল্ফ) এবং দ্যাট (বিয়িং-ফর-অ্যানাদার)। দিস ডিটারমিনেট বিয়িং এবং দ্যাট ডিটারমিনেট বিয়িং। এই ডিফারেন্স থেকে আবার ইউনিটি তৈরি হচ্ছে — বিয়িং-ফর-সেল্ফ বা ওয়ান। যে ওয়ান থেকে তৈরি হচ্ছে নতুন ভূমি, সেখানে পাচ্ছি মেনি, অর্থাৎ আবার ডিফারেন্স। এবং এই মেনি নামক বর্গের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাচ্ছি কোয়ান্টিটি এবং মেজার। এবার এই পুরো প্রক্রিয়ার গতিপথটা ভাবুন —

ইউনিটি (পিওর বিয়িং) → ডিফারেন্স (ডিটারমিনেট বিয়িং — বিয়িং-বাই-সেল্ফ, বিয়িং-ফর-অ্যানাদার) → ইউনিটি (বিয়িং-ফর-সেল্ফ / ওয়ান) → ডিফারেন্স (মেনি) → ...

এই পদ্ধতি বেয়ে ওয়ান আমাদের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে মেনি হয়ে। প্রতিভাত হচ্ছে প্রকাশিত হচ্ছে অ্যাপিয়ার করছে। প্রতিমার গর্জন তেল মাখানো ঝকঝকে মুখের মেনির অ্যাপিয়ারেন্স ঝলসে উঠছে আরতির আলোয়, তার ভিতরে পিছনে অন্দরে শরীরটা মাটির আর খড়ের, আর বিসর্জনের এক রাত পরেই জলে ভাসা শবের মত সস্তা পেরেক লাগানো বাঁশের চটার আর চ্যালাকাঠের, নির্জলা ওয়ানের। আমরা আমাদের চারপাশে যে বাস্তবতাকে পাই আমাদের ইন্দ্রিয় ও বোধ দিয়ে, তা একই সঙ্গে ওয়ান এবং মেনি, ইউনিটি এবং ডিফারেন্স। আপাতদৃষ্টিতে এগুলো দ্বান্দ্বিক পরস্পরবিরোধী এবং কন্ট্রাডিক্টরি বর্গ। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এরা সবাই একত্রিত থাকে এই বাস্তবতাতেই। অর্থাৎ, আমাদের সম্মুখবর্তী এই বাস্তবতাটা ইউনিটি এবং ডিফারেন্স-এর একটা উচ্চতর ইউনিটি। এই উচ্চতর ঐক্য বা হায়ার ইউনিটি-টাকে হেগেল ডেকেছিলেন গ্রাউন্ড বা ভিত্তি বলে।

এবার এই উচ্চতর ঐক্য বা ভিত্তি মানে গ্রাউন্ড এর দুটো মুহূর্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে ইউনিটি বা ওয়ান, এবং ডিফারেন্স বা মেনি। ইউনিটি (ওয়ান) হয়ে দাঁড়াচ্ছে তার পজিটিভ। এবং ডিফারেন্স (মেনি) তার নেগেটিভ। অর্থাৎ, আমরা তিনটে নতুন বর্গ পেলাম — গ্রাউন্ড মানে হায়ার ইউনিটি, পজিটিভ মানে ইউনিটি এবং নেগেটিভ মানে ডিফারেন্স। উচ্চতর ঐক্যের হায়ার ইউনিটির গ্রাউন্ড এবং তার দুটো মুহূর্ত ইউনিটি এবং ডিফারেন্স। এখানে মাথায় রাখার এইটাই যে, আমরা হায়ার ইউনিটির গ্রাউন্ড-টাকে কিন্তু কোনো এম্পিরিকাল রকমে পেলাম না, যেমন ভাবে আমরা আমাদের অচেনা কোনো বস্তু বা সত্তাকে আবিষ্কার করি বস্তুপৃথিবীতে আমাদের অভিজ্ঞতার জগতে। বরং, এই গ্রাউন্ডকে আমরা পাই একটা যুক্তিনির্মাণের পথ ধরে। হেগেলের লজিক মোতাবেক এগোতে এগোতে। যুক্তিটা অনেকটা এইরকম — আমরা আমাদের

বাস্তবতায় যখন ইউনিটি আর ডিফারেন্স দুটোকেই উপস্থাপিত হতে দেখছি, খুঁজে পাচ্ছি ঐক্য আর পার্থক্য দুটোকেই, আবার আমাদের এই সাধের বাস্তবতা তাতে ফেটে ছিটকে ছড়িয়ে ভিত্তার হয়ে অবাস্তবতা হয়েও যাচ্ছে-না, তখন, অবভিয়াসলি, তাদের একটা উচ্চতর ঐক্য থাকছে — মেলাবেন তিনি মেলাবেন, ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়িটার ওই ভাঙা দরজাটা তিনি মিলিয়ে দিচ্ছেন — সেই মেলানেওয়ালারই নামটাই আমরা দিলাম উচ্চতর ঐক্য বা ভিত্তি বা গ্রাউন্ড। ঝোড়ো হাওয়া তারই একটা মোমেন্ট বা মুহূর্ত। পোড়ো বাড়ির ভাঙা দরজা আর একটা।

কিন্তু হেগেলের যুক্তিবিজ্ঞান অনেকটা শার্লক হোমসের অনুসন্ধানের মত, ওয়াটসন যতই অবাক হোক, যদি যুক্তি দিয়ে কোনো একটা কিছুকে নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়, অকুস্থলে তার চিহ্ন বা পদচিহ্ন পাওয়া যাবেই যাবে। লন্ডনের এবড়োখেবড়ো অন্ধকার গলি দিয়ে যেতে যেতে জানলার চিক নামানো ঘোড়ার গাড়ির ভিতরে বসে শার্লক যে ল্যাংড়া লোকটার কথা বলল, ঠিক তার পদচিহ্নই খুঁজে পেল ওয়াটসন খিড়কির বাতায় অপ্রত্যাশিত ক্রিয়োজোটের অক্ষরে। (এটা হতেই হবে, কারণ শার্লক তো যুক্তিকাঠামো মেনে এগচ্ছিল! সত্যিই, দর্শনের বইয়ের বাইরে, রিজন উইথ এ ক্যাপিটাল আর, মানে আলোকপ্রাপ্তির যুক্তিদর্শনের, বোধহয়, সবচেয়ে বড় উদাহরণ শার্লক হোমসের তদন্ত পদ্ধতি। ক্রমবিকাশমান পুঁজির সংস্কৃতির সবচেয়ে উজ্জ্বল পার্সোনা, এত স্মার্ট এত ঝকঝকে এত বুদ্ধিদীপ্ত এবং সবচেয়ে বড় কথা, এত রেলাবাজ। কোনো পিতা কোনো ঈশ্বরকেই তো মানত না শার্লক, শুধু যুক্তিকে মানত, এবং বুদ্ধিচর্চাকে। আপামর পিতা পতি এবং ঈশ্বরের জায়গায় রিজন উইথ এ ক্যাপিটাল আর-কে বসিয়েছিল নবজাগরণ, পুঁজির পরোক্ষ বিপ্লব।) তাই, হেগেলের যুক্তিশাস্ত্রে একবার যাকে যুক্তিগঠন মোতাবেক পাওয়া গেল তাকে এবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠতেই হবে, তার চকচকে মুখে আলো পড়বেই। হেগেলের ভাষায়, সে শাইন ফোর্থ করবেই।

এই ভিত্তি বা গ্রাউন্ড তাই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এক্সিসটেন্ট বা থিং-এর আকারে। আমাদের চারপাশের বস্তুজগতের থিং-এরা তাই, আর একভাবে দেখলে, প্রতিনিধিত্ব করে গ্রাউন্ড-এর। আর গ্রাউন্ড উপস্থাপিত করে থিং-কে, এবং সেই প্রক্রিয়াটাকে, যার মারফৎ গ্রাউন্ডের প্রতিনিধি হয়ে থিং নির্মিত হয়, থিং থিং হয়ে ওঠে। গ্রাউন্ড তাই থিং-এর অস্তিত্বটাকেই উপস্থাপিত করে, এক্সিসটেন্ট-এর এক্সিসটেন্স-টাকে। কিন্তু, এই গ্রাউন্ড, যাকে আমরা এইমাত্র চিহ্নিত করলাম — একে দিয়ে থিং-কে, থিং-দের বস্তুজগতকে পুরোপুরি বোঝা যায় না। এই গ্রাউন্ড তার এক্সিসটেন্ট-দের থিং-দের যথেষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। একটা উদাহরণ আনা যাক। ধরুন, ঠিক যেরকম শুধু কাঠ দিয়ে একটা চেয়ারকে পুরোপুরি বোঝা যায় না, সেখানে আরও অনেককিছু তার বাইরে পড়ে থাকে — যে শ্রমটা লেগেছে এই চেয়ারটা বানাতে, বা, যে কারখানায় তৈরি হয়েছে চেয়ারটা সেই সংস্থার সংগঠন — এরকম আরো অনেক কিছু। একা একলা একটা চেয়ারকে, বা যে কোনো বস্তুকেই একলা একা তার ভিত্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা না গেলে, অন্য আরো বস্তুদের সত্তাদের দরকার পড়লে, এই রকম অবস্থায় এই অযথেষ্ট গ্রাউন্ডকে আমরা ডাকি ইনসাফিশিয়েন্ট গ্রাউন্ড বলে।

এই অযথেষ্ট ভিত্তি বা ইনসাফিশিয়েন্ট গ্রাউন্ড থেকে ক্রমশঃ আমরা যথেষ্ট ভিত্তি বা সাফিশিয়েন্ট গ্রাউন্ডে পৌঁছই। যে যথেষ্ট ভিত্তি যথেষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে থিং-কে, থিং-দের বস্তুজগতকে। এই গ্রাউন্ড আর থিং — হেগেলের তত্ত্বে এই দুটো দার্শনিক বর্গের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্য দুটো নাম আছে, আরো পরিচিত এবং আরো বিখ্যাত — এসেন্স এবং অ্যাপিয়ারেন্স। সার এবং প্রকাশ। এই শব্দগুলো এই দর্শনের কাঠামোর বাইরে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নিয়তই ব্যবহৃত হচ্ছে, নানা জায়গায়, এবং, ফলতঃ, তাদের সঙ্গে নানা অর্থ সবসময়েই সেঁটে যাচ্ছে, সেইরকম চালু প্রাত্যহিক অর্থের জায়গা থেকে আমাদের একটা প্রবণতা থাকে এসেন্স-কে প্রকৃত মূল আদত সত্য বলে ধরে নেওয়া, এবং অ্যাপিয়ারেন্স-কে কোনো না কোনো ধরনের চোট্টামি বলে। কিন্তু, এসেন্স বা অ্যাপিয়ারেন্স কেউই সত্য বা মিথ্যা নয়, তারা দুজনেই সমান সত্য। প্রকাশ তো সারেরই প্রকাশ, অ্যাপিয়ারেন্স তো এসেন্সেরই অ্যাপিয়ারেন্স। কিন্তু, আর একবার মনে পড়াই, এই এসেন্স মানে গ্রাউন্ড কিন্তু ভিত্তি হিশেবে যথেষ্ট নয়। এসেন্স তার অ্যাপিয়ারেন্সকে, তার থিংদের, যথেষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনা। এসেন্সের ওই ভিত্তি যথেষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়না তার অ্যাপিয়ারেন্সে,

সম্মুখবর্তী বস্তুজগতে। কিন্তু, তার মানেই তো এই যে, ঠিক ওই কাঠ আর চেয়ারের মত আরো কিছু আরো অতিরিক্ত সেখানে বাইরে রয়ে যাচ্ছে, পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে গেলে যাদের দরকার। ভিত্তি দিয়ে এসেন্স দিয়ে গ্রাউন্ড দিয়ে শুধু একটি জিনিষকে আর ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, আরো আরো সব জিনিষের দরকার পড়ছে। অর্থাৎ, প্রথম থেকেই এসেন্স দিয়ে একটা একক একবচন বস্তুকে আর ব্যাখ্যা করা গেল না, তাকে ব্যাখ্যা করতে হল আরো সব জিনিষকে সঙ্গে মিলিয়ে, মানে, অন্য আরো সমস্ত জিনিষের সঙ্গে বহুবচনে, প্লুরালিটিতে। তার মানে, অ্যাপিয়ারেন্স জগতে, কোনো থিং কখনো একা একলা নেই, সবসময়েই তার চারপাশে রয়ে যাচ্ছে অন্য সব থিং, আদার থিংস, অন্য বস্তুরা। একা কোনো বস্তুকেই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না তার গ্রাউন্ড বা অ্যাপিয়ারেন্স দিয়ে। একটা থিং রয়েছে অন্য আর সব থিংদের সঙ্গে। সবার সঙ্গে মিলে — একটা সমগ্রে।

এবার এলো এই সমগ্র বা হোল-এর ধারণা। যেই এবার আমরা সমস্ত বস্তদের নিয়ে বস্তুজগতকে একটা সমগ্র বলে, হোল বলে ভাবলাম, তখনই ওই থিং-রা আর নিছক বিচ্ছিন্ন একক থিং আর রইল না, তারা প্রত্যেকেই হয়ে দাঁড়াল ওই সমগ্রের অংশ, ওই হোল-এর পার্ট। এর মানে কখনোই এই নয় যে ওই বিচ্ছিন্ন একা একক থিং-গুলোর নিছক একটা সমষ্টি বা সমবায় বা সমাহারই হল সমগ্র। অংশগুলো একটার সঙ্গে আর একটা যোগ করে আমরা সমগ্র পাচ্ছি না, বরং, গতিটা এর উল্টোটা বলা যায়, হোল বা সমগ্র হল পার্ট বা অংশর অগ্রবর্তী, প্রায়র। আমরা হোল থেকে প্রবাহিত হতে দেখছি পার্টকে। যেমন গ্রাউন্ড থেকে প্রবাহিত হয় থিং-রা। পার্ট বা থিংরা প্রবাহিত হয় একটা সর্বব্যাপী এবং সাধারণ ধারণাগত ঐক্য বা ইউনিটি থেকে যার নাম হোল বা সমগ্র।

হোল-পার্ট এই সম্পর্কটা স্পষ্ট হয় সমাজ এবং ব্যক্তির সম্পর্কে। সমাজ যেমন জাস্ট যাবতীয় ব্যক্তির সংগ্রহ নয়, সমাজ মানে একটা গোটা পদ্ধতি — যার মধ্যে ওই ব্যক্তিরা আছে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে, তাদের ইতিহাস আছে, ভূগোল আছে, সংস্কৃতি আছে, নিয়ম আছে, নিয়মভঙ্গ আছে — সমাজ বলতে আমরা বুঝি এই পুরোটাকে মিলিয়েই। বরং আমরা ব্যক্তি বলতে যেটা বুঝি, সেই ধারণাটাকে ধরতে গেলেই তাদের একটা বৃহত্তর ভূমি মানে সমাজ দরকার পড়ে। তারপর সেই সমাজের তলে প্রত্যেকের নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র স্থানাঙ্কে স্থাপিত করে আমরা ব্যক্তিকে বুঝি। আমরা যে ব্যক্তিকে বুঝি সে সামাজিক ব্যক্তি। এই ব্যক্তিকে আমরা পেতামই না যদি না সমাজ তার গোটা ইতিহাস এবং সংস্কৃতি নিয়ে হাজির থাকত। ঠিক একই ভাবে হেগেলের এই সমগ্র-অংশ সম্পর্কে অংশ বা পার্টদের পেতে গেলে তার আগে আমাদের হোলকে প্রয়োজন পড়ে। নইলে এই পার্টদের ব্যাখ্যাই করা যায় না। হোল এখানে জায়গা নেয় কন্টেন্ট-এর, বা মর্মবস্তুর। যে কন্টেন্ট বা মর্মবস্তু তার আকার পায় পার্টদের আধারে, পার্টরা তার ফর্ম। যে আকার বা ফর্মের মধ্যে দিয়ে কন্টেন্ট বা মর্মবস্তু উদ্ভাসিত প্রকাশিত হয়।

যুক্তিনির্মাণের এই প্রক্রিয়ায় এক্সিসটেন্ট বা থিংদের পৃথিবীটা ফুটে ওঠে একটা সমগ্রের অংশের আকারে, একটা হোলের পার্ট হিশেবে। কিন্তু, সমগ্র থেকে সমগ্রে সমগ্র আর অংশর সম্পর্কটা একই থাকে না। সমগ্র আর অংশর এই সম্পর্কটা হতে পারে দুরকম। নেসেসারি আর কন্টিনজেন্ট, জরুরি আর চালু। জরুরি সম্পর্ক তৈরি হয় তখনই যখন অংশগুলোর অংশ হিশেবে থাকাটা বাধ্যতামূলক হয়। তখন সেই সমগ্রকে আমরা বলি নেসেসারি হোল। আর চালু সম্পর্ক মানে যখন একটা বিশেষ অংশ একটা বিশেষ সময়ে একটা বিশেষ সমগ্রে আছে বটে, কিন্তু অন্য আর একটা মুহূর্তে এই সমগ্রে সে না-থাকতেই পারে। তখন সেই চালু অংশদের নিয়ে তৈরি সমগ্রকে আমরা বলি কন্টিনজেন্ট হোল। ধরুন আপনি একটা ক্লাবের মেম্বার, ক্লাব নামক সমগ্রের সঙ্গে আপনি নামক অংশের সম্পর্কটা চালু বা কন্টিনজেন্ট। কিন্তু সমাজ নামক সমগ্রের সঙ্গে অংশ হিশেবে আপনার সম্পর্কটা কিন্তু জরুরি বা নেসেসারি। (একটা ব্যাপার লক্ষ্য করুন, হেগেলের তত্ত্বের উদাহরণ দিতে গিয়ে বারবার আমাদের 'সমাজ' নামক ধারণাটাকে ব্যবহার করতে হচ্ছে। আসলে অন্য কিছু দিয়ে হেগেলের তত্ত্বের বিশদীকরণ বোধহয় অসম্ভব। গোটা তত্ত্বটাই এমন ভাবে সমাজ, সমাজের ইতিহাস এবং সমাজভাবনার সঙ্গে গ্রথিত।)

এবার এই দুইরকমের সমগ্রের ভিতর থেকে শুধু জরুরি বা নেসেসারি সমগ্ররাই হেগেলীয় অর্থে যুক্তিসিদ্ধ। তারা যুক্তিগঠন মানে। মনে করুন একটু আগে আমাদের আলোচনা, যা যুক্তিসিদ্ধ তা স্বতঃপ্রকাশিত হয়ে উঠবেই। এবং সেটাই ঘটমান বা অ্যাকচুয়াল। সেটাই বাস্তবতার একমাত্র সম্ভাবনা। একমাত্র যুক্তিসিদ্ধই ঘটমান হতে পারে, এবং যুক্তিসিদ্ধকে ঘটমান হতেই হবে। ঠিক যে ভাবে গ্রাউন্ড নিজেকে প্রতিভাত করে তোলে থিং বা এক্সিসটেন্ট-এর আকারে, সমগ্রেরও এক্ষেত্রে একটাই নিয়তি — একটা ঘটমানতা বা অ্যাকচুয়ালিটি হয়ে ওঠা। বাস্তব সমগ্র মানেই যুক্তিসিদ্ধ সমগ্র জরুরি সমগ্র, হেগেলের লজিক মোতাবেক ঘটে ওঠা একটা অ্যাকচুয়ালিটি। এই অ্যাকচুয়ালিটির যুক্তিসিদ্ধ জরুরি সমগ্রটাকেই আমরা ইউনিভার্সাল আকারে ভাবি। তাই অংশ বা পার্টরা যখন তাদের সমগ্র বা হোলের জরুরি অংশ তখন সেই সমগ্রকে আমরা ডাকি ইউনিভার্সাল বলে। এই ইউনিভার্সাল থেকেই অংশরা প্রবাহিত হয়। এই পার্টরা তখন ওই ইউনিভার্সালের পার্টিকুলার। আর ইউনিভার্সালের সঙ্গে তার পার্টিকুলারদের সামগ্রিক ঐক্যকে আমরা বলি সিংগুলার। সিংগুলার হাজির করে ইউনিভার্সালকে তার নিজস্ব পার্টিকুলার এক্সিসটেন্ট-এর আকারে। পার্টিকুলারদের অভ্যন্তরে, অবশ্যই, অনেক কন্ট্রাডিকশন বা দ্বন্দ্ব কাজ করে, এবং কাজ করে ইউনিভার্সাল আর তার পার্টিকুলারদের ভিতরেও। এই ইউনিভার্সাল আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে বদলাতে বিবর্তিত হতে হতে যায়, নিম্নতর থেকে উচ্চতর মুহূর্তে, যেমন আমরা আগেই বলেছি দুই তিন চার নম্বর সেকশনে। তখন আমরা পাই ইতিহাসের তত্ত্ব, যেখানে কাজ করে এসেন্স, নিগেশন এবং নিগেশনের নিগেশন। এইভাবে বদলাতে বদলাতে একসময় ইউনিভার্সাল তার উচ্চতম মুহূর্তে পৌঁছয়, যখন তার আর কোনো বদল ঘটে না। এই স্তরটাকেই আমরা বলি আইডিয়া। হেগেলের যুক্তিবিদ্যার গঠন অনুযায়ী ইতিহাস এখানে শেষ হয়। এন্ড অফ হিস্ট্রি।

আমাদের সঙ্গে হেগেলের সবচেয়ে বড় মতানৈক্যের জায়গাটা এই ইতিহাসের সমাপ্তির তত্ত্বে। আমরা এটা মানি না, এবং মানিনা তার যুক্তিবিদ্যার ওই সারবাদী বা এসেনশিয়ালিস্ট গঠনকেও। তাই এবার আমরা এই বিষয়গুলোকে বাদ দিয়ে আর এক ভাবে হেগেলকে বুঝতে চাই।

৭।। হেজেমনিক ফর্মেশন

আমরা যদি হেগেলের এসেনশিয়ালিজম বা তাঁর ইতিহাসের সমাপ্তির তত্ত্ব না-মানি, তার অর্থ তার ইউনিভার্সাল ধারণা-ও আমাদের কাছে আর ব্যবহারযোগ্য থাকে না। আমরা তো আর 'উৎস' বা 'অরিজিন'-এর ধারণায় বিশ্বাস করছি না, তাই সেই ইউনিভার্সাল, যার থেকে পার্টিকুলাররা প্রবাহিত হয় এবং নির্মাণ করে একটা এসেনশিয়ালিস্ট সমগ্র, তাকেও আমরা আর মানতে পারি না। আমরা হেগেলের ওই সাফিশিয়েন্ট গ্রাউন্ড-এর গোটা এসেনশিয়ালিস্ট ধারণাটাকেই সম্পূর্ণ পরিহার করছি।

হেগেলের সঙ্গে আমাদের মতপার্থক্যের শুরু ডকট্রিন অফ বিয়িং থেকেই। বিয়িং-ফর-সেল্ফ ধারণাটা থেকে শুরু করা যাক। হেগেলের বিয়িং-ফর-সেল্ফ নামক বর্গ — যার নিজের রিয়ালিটিই তার নিগেশনকে ধারণ করে। এই বর্গ হেগেলের তত্ত্বে ফিরে ফিরে এসেছে ওয়ান-এর আকারে, ইনফিনিটি-র আকারে। ইনফিনিটি হল সেই বর্গ যেখানে আমরা পৌঁছই একটা সত্তাকে আলাদা করে চেনার পদ্ধতিতে। ধরুন আমি একটা গাছ দেখলাম। এই গাছ, দিস। অন্য আর একটা গাছ দেখলাম, দ্যাট। দ্যাট গাছ দিস গাছকে নাকচ করল। প্রথম গাছটা হল তাই যা দ্বিতীয় গাছ নয়। আর একটা গাছ দেখলাম, দ্যাট গাছকে যা নিগেট করল, ধরুন সেটা দ্যাট১। আরো গাছ দেখছি, আরো, আরো ...। এই বা দিস গাছকে নিগেট করে পেলাম দ্যাট, তাকে নিগেট করে পেলাম দ্যাট১, তাকে নিগেট করে দ্যাট২, তাকে নিগেট করে দ্যাট৩ ...। লক্ষ্য করুন, আমার চেনার প্রক্রিয়াটা কখনোই সম্পূর্ণ হচ্ছে না, এই ভাবে না না করে কিছু চেনা যায় না, হেগেল বলেছিলেন, এটার নাম ব্যাড ইনফিনিটি। তাহলে ইনফিনিটিতে পৌঁছব কী করে? হেগেল বললেন, লাফিয়ে, মানে একটা লিপ করে, একটা উত্তরণের মাধ্যমে। একটা উচ্চতর বর্গ তৈরি করে, যা এই গাছ ওই গাছ সব গাছকেই নিজের মধ্যে নিয়ে আসে। এইভাবেই আমরা পেয়েছিলাম ওয়ান বা বিয়িং-ফর-সেল্ফ যা বিয়িং-বাই-সেল্ফ মানে দিস আর বিয়িং-ফর-অ্যানাদার মানে দ্যাট দুটোকেই নিজের মধ্যে ধারণ করে। এবার প্রশ্নটা

হল এই যে, আমাদের কাছে এই ইনফিনিটি ধারণাটা এসে পৌঁছয় কী করে? হেগেল বলবেন, এই বর্গটা আমাদের কাছে রিভিল্ড হয়, উদঘাটিত হয়। যেমন করে আমাদের কাচে শাস্ত্রীয় শ্লোকের গোপন অর্থ উদঘাটিত হয় গুরু মারফত। গুরু পেলেন কী করে? তার গুরু, তার গুরু, ...। শেষ অব্দি হয়ত সব উদঘাটনেরই নায়ক ঈশ্বর। কিন্তু আমরা উদঘাটনে, রিভিলেশনে বিশ্বাস করি না। তাই আমরা শুরু করলাম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা বা ডিটারমিনেট বিয়িং থেকে। ডিটারমিনেট বিয়িং, তার রিয়ালিটি, এবং তার নিগেশন।

ডিটারমিনেট বিয়িং বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা মারফত আমাদের এই ঘুরপথ আসলে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার ধারণাটাকে নিয়ে আসে — যা আমাদের সামনে রিয়ালিটি এবং তার নিগেশনকে চিহ্নিত করে দেয়, মানে, ওই সত্তাটা ঠিক কী, এবং কী নয় দুটোকেই দেগে দেয় এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার ধারণা। অর্থাৎ, এখানে এপিস্টেমলজি বা জ্ঞানতত্ত্ব থেকে অন্টলজি বা অস্তিত্বতত্ত্বের কোর্টে আমরা বলটা নিয়ে এলাম। সত্তাকে আমরা কী ধরণের বর্গ দিয়ে বুঝব — এই জায়গা থেকে প্রশ্নটাকে নিয়ে এলাম — সত্তাকে আমরা কী দিয়ে চিনব। পরে আমরা দেখব, আমাদের সঙ্কর শাসন বা সিন্থেটিক হেজেমনির ধারণার সঙ্গে এই ঘুরপথটা অত্যন্ত সম্পর্কিত। অনেকেই সত্তার এমন একটা ধারণা থেকে শুরু করেন যা শুধু রিয়ালিটিকেই ভাবে, তারপর আরো আরো রিয়ালিটিকে এনে সেই সমস্ত রিয়ালিটিকে একত্রে তাদের বহুবচনতায় ভাবার চেষ্টা করেন। এই ভাবেই কমপ্লেক্স স্পেস বা জটিল ভূমির তত্ত্বকাঠামো নির্মিত হয়। আবার উত্তরআধুনিকরা শুরু করেন রিয়ালিটির উল্টো নিগেশন থেকে, সেখান থেকে নির্মাণ করেন তাদের বাস্তবতার মানচিত্র। দুটোই, আমাদের কাছে, একচক্ষু হরিণের দৃষ্টি দিয়ে বিয়িং বা সত্তাকে দেখা।

এবার, আর একবার স্মৃতিতে আনুন সেকশন এক-এ ওভারডিটারমিনেশন বা অতিনির্ণয় নিয়ে আমরা যা বলেছিলাম। যা দিয়ে আমরা আমাদের এপিস্টেমলজি বা জ্ঞানতত্ত্বে ঢুকছি। যেখানে প্রতিটি বর্গই অন্য বর্গের দ্বারা নির্মিত ও নির্ণীত। আর, তাই যদি হয়, তাহলে হেগেলের তত্ত্বের ওই বাইনারি বৈপরীত্য আর থাকছে না। রিয়ালিটি আর নিগেশন-ও পরস্পর অতিনির্ণীত হয়ে পড়ছে। এবার একাধিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা বা ডিটারমিনেট বিয়িং-কে একসঙ্গে ভাবুন। তারা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিকতায়, ইন্টারাকশনে রত। আমাদের সিন্থেটিক শাসনের ভূমি সিন্থেটিক স্পেস হল এইরকম একটা তল যেখানে সবগুলো ডিটারমিনেট বিয়িং মিলে একটা অতিনির্ণীত ঐক্য নির্মাণ করেছে যারা প্রত্যেকেই অন্য প্রত্যেকের দ্বারা অতিনির্ণীত এবং এই ডিটারমিনেট বিয়িংদের প্রত্যেকেই তার নিজের রিয়ালিটি এবং নিগেশনের একটা অতিনির্ণীত ঐক্য বা ওভারডিটারমিন্ড ইউনিটি। তার মানে, এখানে অতিনির্ণয় কাজ করছে দুটো আলাদা স্তরে। একটা উচ্চতর অতিনির্ণীত ঐক্য — সব ডিটারমিনেট বিয়িং-গুলোকে মিলিয়ে। আর একটা অতিনির্ণীত ঐক্য প্রতিটি ডিটারমিনেট বিয়িং-কে ঘিরে, তার রিয়ালিটি এবং নিগেশন-কে মিলিয়ে।

কিন্তু, এখান থেকে অন্য একটা প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে — একটা ডিটারমিনেট বিয়িং-এর রিয়ালিটি বলতে আমরা ঠিক কী বুঝছি? হেগেলের যুক্তিশাস্ত্রে এই প্রশ্নটার গুরুত্ব তুলনায় অনেক কম, কারণ, তার কাঠামোয় রিয়ালিটি হল নিছক একটা মুহূর্ত — চূড়ান্ত আরব্ধ মানে সাফিশিয়েন্ট এসেন্স বা ইউনিভার্সালের ধারণায় পৌঁছনোর পথে। তাই হেগেলের রিয়ালিটি ধারণায় যদি কোনো অস্বচ্ছতা থাকেও তাতে খুব কিছু যায় আসে না। কারণ হেগেলের কাঠামোয় সামথিং মানে ডিটারমিনেট বিয়িং কে তো সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টাও করা হয় না। কিন্তু আমরা তো হেগেলের এসেন্স ধারণার শরিক নই। তাই, রিয়ালিটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বর্গ, আমাদের খুব স্পষ্ট ভাবে বোঝা দরকার আমরা রিয়ালিটি বলতে ঠিক কী বুঝছি।

আমাদের কাছে রিয়ালিটি মানে একটা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, হেজেমনিক ফর্মেশন, যে অর্থে লাকলাউ-মুফে ব্যবহার করেছেন বর্গটাকে। (নিয়ন্ত্রণ ও রোগলক্ষণ, অনুষ্টুপ শারদীয় ২০০০)। লাকলাউ মুফে সমস্ত আলোচনাটাকেই নিয়ে আসেন আলোচনাগত ভূমি ডিসকার্সিভ স্পেসের তলে। সেই তলে সমস্ত বর্গ সমস্ত বদল ঘটনা ধারণা সবকিছুই বোঝা হয় দ্যোতক বা সিগনিফায়ার-দের নিরিখে, তাদের সমাহার, তাদের গতি, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের বদলের নিরিখে। (সিগনিফায়ার আর সিগনিফায়েড মিলে বানিয়ে তোলে একটা সাইন বা চিহ্নের ব্যাকরণ। ওই চিহ্ন দিয়ে যে অর্থ তৈরি হচ্ছে সেটা সিগনিফায়েড, আর যা দিয়ে অর্থটা তৈরি হচ্ছে সে সিগনিফায়ার।) তাই, লাকলাউ মুফের তত্ত্বে পুরো বাস্তবতা কাঠামোটা হয়ে

দাঁড়াল একটা চিহ্ন কাঠামো, দ্যোতক আর দ্যোতিত-র পারস্পরিক সম্পর্কের একটা কাঠামো। সমস্ত ক্ষমতা সমস্ত নিয়ন্ত্রণকে এবার তারা এই দ্যোতকদের সমাহার, তাদের গতি, এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক দিয়ে বুঝছেন। এবার, এই রকম একটা কাঠামোয়, হেজেমনিক ফর্মেশন বা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো হল একটা সমাহার বা সেট, কিছু নির্দিষ্ট দ্যোতক বা সিগনিফায়ার-এর। ইতস্তত আলগা ভেসে বেড়ানো সমস্ত দ্যোতক বা সিগনিফায়ারদের মধ্যে এই নির্দিষ্ট সিগনিফায়ার-গুলোর বিশেষত্ব এই যে তাদের ভেসে বেড়ানোর মধ্যে একটা গতির আকার আছে। দেখা যাচ্ছে যে তারা একটা বিশেষ গিঁট বা জটের বিশেষ একটা বিন্দুর চারপাশে ঘুরছে। এই বিশেষ জট বা গিঁট বা নোডাল পয়েন্টটা আবার গড়ে উঠেছে ওই দ্যোতকদের একটা ক্ষুদ্রতর সমাহার বা সাবসেট-কে নিয়ে। এই সাবসেটের সিগনিফায়ারদের বিশেষত্বটা এই যে, ওই নোডাল পয়েন্টটা তাদের প্রিভিলেজ করছে, তাদের উপর একটা বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করছে। এই বাড়তি গুরুত্ব পাওয়া দ্যোতকগুলোর নিজেদের চারপাশে ছড়িয়ে যাওয়া উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে তৈরি হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ বা হেজেমনি। একটা সরলীকৃত উদাহরণ বানানো যাক। আমরা পাঁচপেঁচি লোকেরা আমাদের আদার ব্যবসার বাস্তবতার মধ্যেই যখন এফিশিয়েন্সি নিয়ে কথা বলি, তখন আমরা খেয়ালই করিনা যে ওই এফিশিয়েন্সি ধারণাটা, আধুনিকতা ইত্যাদি আরো কিছু দ্যোতকের সঙ্গে মিলে, সিনেমায় দেখা বোম্বের বা বিদেশী অফিসের বাড়ির নরনারীর নানা ছবির (এরা সবাই নানা ধরনের দ্যোতক) তৈরি করছে একটা বিশেষ আবহ, যে আবহ কিছু বাড়তি মানে দিচ্ছে এফিশিয়েন্সি মডার্নিজম ইত্যাদি বিশেষ দ্যোতকগুলোর উপর, এরা আসলে হেজেমনিক পুঁজি ক্ষমতার আরোপিত গুরুত্বের ধারক। এদের চারদিকে এদের উদ্বৃত্ত অর্থে তৈরি হচ্ছে ওই আবহ। এদের দিয়ে যা বোঝানো হয় এই বিশেষ শব্দগুলো তো সবসময়ই তার চেয়ে বেশি কিছু বোঝায়। যেই কেউ এফিশিয়েন্সি শব্দটা ব্যবহার করে, তার চারপাশে আধুনিকীকরণ এবং তার বিরোধকে নিয়ে রাজনীতির, সাম্রাজ্যবাদ এবং তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতির, বাড়তি অর্থগুলো উপচিয়ে পড়ে। এই আবহটা এবার এদের চারপাশে আরো অনেক দ্যোতককে বদলে দিচ্ছে, বদলে দিচ্ছে 'ট্রেড ইউনিয়ন' নামক শব্দটাকে, সে এতদিন যে অর্থটা তৈরি করত সেটাই বদলে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে এমনকি অনেক দূরের 'সংসার' 'পরিবার' ইত্যাদি দ্যোতকও, এই পুরো বদলে যাওয়ার গতিটাকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে হেজেমনি বা নিয়ন্ত্রণ।

একটা ভেসে বেড়ানো আলগা সিগনিফায়ার বা দ্যোতকের একটা সমাহার, যারা গড়ে উঠছে এবং ভেসে বেড়াচ্ছে একটা নির্দিষ্ট বিশেষ বিন্দুর চারদিকে, যে বিশেষ বিন্দু বা নোডাল পয়েন্টটা আবার একটা সিগনিফায়ারদের ক্ষুদ্রতর একটা সমাহারকে একটা বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করছে, তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ বা সারপ্লাস মিনিং দিয়েই তৈরি হয় দ্যোতকদের সম্পূর্ণ সমাহারটার হেজেমনিক বাস্তবতা। এবার ওই নিয়ন্ত্রণ কাঠামো বা হেজেমনিক ফর্মেশন বলে যদি আমরা ভাবি একটা ডিটারমিনেট বিয়িং-এর রিয়ালিটি-কে, তাহলে এবার প্রশ্ন ওঠে, যদি একাধিক রিয়ালিটি পরস্পরকে অতিনির্ণয় করেই, তাদের মধ্যে এই অতিনির্ণয়টা ঘটে কী করে? কিভাবে তারা এ অন্যের মুখোমুখি দাঁড়ায়, বা এ অন্যকে বোঝে? বা একজনের নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর খামতি অন্যজন মিটিয়ে দেয়?

আমরা ডিটারমিনেট বিয়িং-এর রিয়ালিটিকে লাকলাউ মুফের হেজেমনিক ফর্মেশন দিয়ে বোঝার প্রকল্পে লাকলাউ মুফের মূল মডেল থেকে অনেকটা সরেও এলাম। সরে আসার মূল জায়গা দুটো। এক, আমাদের মনোযোগ এখানে আবদ্ধ ওই পারস্পরিকতার প্রক্রিয়াটায় — দুটো হেজেমনিক ফর্মেশন কিভাবে এ অন্যের সম্মুখীন হচ্ছে। লাকলাউ মুফের কেন্দ্রীয় মনোযোগ কিন্তু অন্য জায়গায়, তারা সবচেয়ে বেশি করে বুঝতে চেয়েছেন একটা একক হেজেমনিক ফর্মেশনের গঠনের জটিলতা। মানে, কী ভাবে একটা হেজেমনিক ফর্মেশনকে আমরা বুঝব। তারা একটি হেজেমনিক ফর্মেশনের গঠনের খুঁটিনাটিকে প্রশ্ন করে গেছেন এবং সমস্যাটাকে তাত্ত্বিক তলে গ্রথিত করেছেন। দুই, একটা হেজেমনিক ফর্মেশনের সমস্যার তাত্ত্বীকরণের জায়গাতেও আমাদের কাছে প্রাথমিক বিষয় ওই হেজেমনিক ফর্মেশনের নিগেশন বা নাকচ, এবং এক্সক্লুশন বা বহিষ্কার। আমাদের ধারণায়, ওই হেজেমনিক ফর্মেশনের মধ্যেই তার নাকচের এবং প্রতিরোধের উপাদান-ও আছে, যাকে আমরা বুঝছি ওই নিগেশন বা এক্সক্লুশন দিয়ে। এই দুটো মূল পার্থক্যকে ঘিরে

আরো অনেক পার্থক্য এসেছে আমাদের বোঝার ভঙ্গীর সঙ্গে লাকলাউ মুফের। আমাদের দেখার মধ্যে যে প্রশ্নটা সবচেয়ে বড় ধাঁধা তৈরি করছে সেটা ওই অতিনির্ণয়ের। দুটো হেজেমনিক ফর্মেশনের পারস্পরিক অতিনিয়ন্ত্রণের একটা কাঠামো ভাবুন। মানে, আর এক ভাবে বললে, একটা সঙ্কর ভূমি বা সিন্থেটিক স্পেস ভাবুন। এবার এই রকম একটা কাঠামোয় একটা বশীকরণ এবং বশ্যতার, ডমিনান্স এবং সাবঅর্ডিনেশনের সম্পর্ককে আমরা তাত্ত্বিক ভাবে চিহ্নিত করব কী করে? এই জায়গাটাই নেয় আমাদের মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন বা অতিনিয়ন্ত্রণের অভিনয়-এর ধারণা।

মজার কথা হল, উপরের এই প্রশ্নটা, আমরা আমাদের লেখা যে প্রশ্নটা থেকে শুরু করেছি, মানে, একটা অতিনিয়ন্ত্রিত কাঠামোয় আমি ক্ষমতাকে কিভাবে বুঝব, এই প্রশ্নটা কিন্তু লাকলাউ মুফে একবারো করেননি, বা করেননি অন্য উত্তরআধুনিকরাও। থার্ড স্পেস বা তৃতীয় ভূমির তাত্ত্বিক হোমি ভাভাও করেননি। লাকলাউ মুফের তত্ত্বে, প্রথম আমরা গ্রামশির হেজেমনি ধারণা এবং তার তাত্ত্বিক গঠনকে তার প্রচলিত এসেনশিয়ালিস্ট এলাকার বাইরে প্রয়োগ হতে দেখলাম। কিন্তু এসেনশিয়ালিজম থেকে বার করে এনে গ্রামশির এই প্রয়োগ গ্রামশির তত্ত্বের অনেকগুলো লড়াকু জায়গার সমূহ ভুষ্টিনাশ করে দিয়েছিল। গ্রামশির তত্ত্বে প্রথমেই আসে ব্যক্তিমানুষদের একটা সমাহার বা দল বা সেট কিভাবে আর একটা দলের উপর, সংস্কৃতি দিয়ে, প্রভুত্ব জারি করে। এসেনশিয়ালিস্ট মডেল থেকে বার করে আনা, এবং পুরোনো এসেনশিয়ালিস্ট পাঠগুলোকে মুছে দেওয়া মাত্রই, লাকলাউ মুফে আসলে সেই জায়গাটাই হারিয়ে ফেললেন যেখানে দাঁড়িয়ে এই প্রভুত্বকে বোঝা যায়, বা তাই নিয়ে কথা বলা যায়। কোনো একটা দলকে আর যদি খুব স্পষ্ট ভাবে সেই দল বলে চিহ্নিত করা না যায়, সেই দল এবং অন্য দল সব যদি অতিনির্ণীত হয়, তাহলে প্রভুত্বের প্রশ্নটাই তো গোলমেলে হয়ে গেল, আর কোনো একমুখী প্রভুত্বকে তো দেখানোই যাবে না।

অন্য দিকে, লাকলাউ মুফে যেই হেজেমনিক ফর্মেশনকে একটা একক ভূমি বলে ভাবলেন, যদিও কন্টিনজেন্ট বা চালু বা অস্থায়ী ভূমি, তখনই, একটা ভূমি আর একটা ভূমিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে বা আদৌ করে কিনা এই প্রশ্নগুলোই আর রইল না। সিন্থেটিক স্পেস ওই প্রশ্নগুলোর সম্ভাবনাকে আবার ফেরত আনল, এই অর্থে যে সিন্থেটিক স্পেস বা সঙ্কর ভূমি তো গঠিতই হয় একাধিক হেজেমনিক ফর্মেশনের উপস্থিতির পারস্পরিকতা থেকে। এর সঙ্গে আলোচনায় আনা যায় হোমি ভাভার তৃতীয় ভূমি বা থার্ড স্পেস।

৮।। থার্ড স্পেস এবং হাইব্রিড স্পেস

হোমি ভাভার তৃতীয় ভূমি বা থার্ড স্পেস-এ, গোড়া থেকেই, কোনো সম্ভাব্য বশীকরণ-বশ্যতা সম্পর্ক চিহ্নিত ও লিপিবদ্ধ করার সম্ভাবনাটাই আর থাকেনা, কারণ, তৃতীয় ভূমির তাত্ত্বিক কাঠামোয় সম্পূর্ণ গুরুত্বটাই আরোপিত থাকে রিয়ালিটি নয়, বরং তার নিগেশনের উপর। অন্যত্র আমরা আলোচনা করেছি, হোমি ভাভার থার্ড স্পেস কিভাবে এমন এক পৃথিবীর কাহিনী বিবৃত করে যেখানে আর কোনো দেশ নেই তাই দেশান্তর নই, যেখানে যেকোনো পরিচিতি বা আইডেন্টিটিই আসলে ক্ষমতার তৈরি একরকম রূপকথা। আর তাই এই পৃথিবীতে কোনো কলোনাইজার প্রভু নেই, কলোনি তো নেই-ই, এমনকি পোস্টকলোনিও এক অর্থে আর নেই। তাই, কিছু-নেই এই পৃথিবীতে কিছু-নেই আমরা সবাই নেই-নেই রকমে সবাই সবার সমান। ভাভার থার্ডস্পেস সবকিছুকেই দেখে এই 'নেই'-এর ভিত্তিতে, রিয়ালিটি নয়, তার নিগেশন দিয়ে। তাই, ডিটারমিনেট বিয়িং-এর রিয়ালিটিটাই চলে আসে ইরেজারের নিচে, মুছে যেতে থাকে। কিন্তু বশীকরণ বা ডমিনান্স তো কখনো শূন্যে হতে পারেনা। বশীকরণ মানেই কিছু একটার বশীকরণ, কারুর একটার বশীকরণ। সে কামাখ্যার ভেড়াই হোক বা তৃতীয় বিশ্বের ছাগল মানে প্রাকৃত বা সাবঅল্টার্ন। ডমিনান্স মানেই নির্দিষ্ট একটা ক্ষমতা সম্পর্কে নিয়ে আসা একটা ডিটারমিনেট বিয়িং-কে। সেই রিয়ালিটি ধারণা যত বিদঘুটেই হোক না কেন, যত জটিলই হোক না কেন। তার রিয়ালিটি-ই যদি নেই হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষমতা সম্পর্ক কাজ করবে কী বরে? (এখানে এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ আলোচনা করার জায়গা

নেই। বিশদ আলোচনা আছে — কলোনি যায়নি মরে আজো, অনুষ্টুপ বইমেলা ২০০২)। বশীকরণ সম্পর্ক আনতে হলে যত জটিল হোক, খণ্ডাকৃতি হোক, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হোক, একটা রিয়ালিটি তো লাগবে। ছেঁড়াখোড়া তাপ্পিমারা সেলাইকরা উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক ডিটারমিনেট বিয়িং-এর রিয়ালিটিকে একটা ক্ষমতা সম্পর্কে চিহ্নিত করার স্বার্থে লাকলাউ মুফের তত্ত্বকে নিয়ে আসা যায়। তাদের হেজেমনিক ফর্মেশনের কলকব্জা দিয়ে রিয়ালিটিকে পুনরাহরণের পুনর্নির্মাণের একটা জায়গা করে নেওয়া যায়। আমরা একটু আগে হেগেলের কাঠামোয় যে গ্রাউন্ড-কে পেলাম, সেই 'গ্রাউন্ড' নামক বর্গটাকে লাকলাউ মুফের তত্ত্ব মোতাবেক প্রস্তুত করে নেওয়া যায় — যাতে সেই গ্রাউন্ড এবার বেমানান, যুদ্ধপ্রবণ, ঝগড়াটে ডিটারমিনেট বিয়িংগুলোর আভ্যন্তরীন লড়াইকে ধারণ করতে পারে। সেই যুদ্ধ শেষ হয় ওই বশীকরণ বা ডমিনান্স সম্পর্কে, যখন একটা ডিটারমিনেট বিয়িং-এর রিয়ালিটি, তার দ্যোতকদের মারফত (লাকলাউ মুফের তাত্ত্বিক কাঠামোয় তাই হয়, আগেই বলেছি) অন্য ডিটারমিনেট বিয়িং-এর রিয়ালিটিকে নিজের বশে আনতে পারে। এবং তৈরি হয় অতিনিয়ন্ত্রণের অভিনয় বা মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন। কিন্তু ভাভার তত্ত্বকাঠামোয় সে জিনিষ আনা যায় না। তার জন্যে আমাদের সিন্থেটিক স্পেসের ধারণাকে প্রয়োজন পড়ে। সে কথায় পরে আসছি।

উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক তত্ত্বের জগতে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক বর্গ হাইব্রিড স্পেস বা মিশ্র ভূমি। এই হাইব্রিড স্পেস ধারণাগত ভাবে ভাভার থার্ড স্পেসের খুব কাছাকাছি। অর্জুন আপ্পাদুরাইরা এই হাইব্রিড স্পেসের ব্যবহার করেছেন তাদের সংস্কৃতিবিদ্যা বা কালচার স্টাডিজ-এর আলোচনায়। হাইব্রিড স্পেসকে বলা যায় একটা আমব্রেলা কনসেপ্ট — একটা ব্যাপক সমাহারী ধারণা যা অনেকগুলো ধারণা বা বর্গকে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসে। প্রথমতঃ, যে তত্ত্ব খুব বেশি কিছুকে নিজের আওতায় আনে, সেই তত্ত্ব আসলে খুব ভালো করে কাউকেই আনে না, তাত্ত্বীকরণের একটা খামতি রয়েই যায়। আর, অন্য আরো অনেক আমব্রেলা কনসেপ্টের মত এই হাইব্রিড স্পেসের ধারণাতেও একটা আভ্যন্তরীন উপরচালাকি আছে। এক্ষেত্রে উপরচালাকিটা এইখানে যে সর্বব্যাপিতার সাড়ে-বত্রিশ-ভাজায় মিমিক্রির, মানে অতিনির্ণয়ের মিমিক্রির মুহূর্তগুলো গোপনিত হয়, লুকিয়ে ফেলা হয়। স্পষ্ট তাত্ত্বীকরণের কাঠামোয় এই মিমিক্রিকে নিয়ে আসতে হলে প্রয়োজন পড়ে হাইব্রিড স্পেস নামক বর্গটারই একটা পুর্ননির্মাণ, এবং এই পুর্ননির্মাণটা হতে হবে একটা নিবিড়তর তাত্ত্বিক কাঠামোয় যাতে মিমিক্রির জটিলতর খুঁটিনাটিগুলো ধরা পড়ে যা সতত হাইব্রিড স্পেস দিয়ে ধরা যায় না। তার চালু পরিচিত চেহারায় হাইব্রিড স্পেস আসলে বড্ড বেশি ধরনের বড্ড বেশি সংখ্যক ভূমিকে চিহ্নিত করে। হাইব্রিড স্পেসের এই ছাতার কনসেপ্টের, মানে, আমব্রেলা কনসেপ্টের আওতায় পড়ে কমপ্লেক্স স্পেস বা জটিল ভূমি, থার্ড স্পেস বা তৃতীয় ভূমি, এবং সিন্থেটিক স্পেস বা সঙ্কর ভূমি। হাইব্রিড স্পেসের তাত্ত্বিক মাপকাঠিগুলো এতই উদার যে তা দিয়ে এই সবরকম ভূমিকেই ধরা যায়। আর মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন বা অতিনিয়ন্ত্রণের অভিনয় — যা দিয়ে আমরা উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক ভূমিতে ক্ষমতার ব্যাকরণ খোঁজার চেষ্টা করছি সেই কলকব্জা ফিট করা যায় এর মধ্যে একমাত্র সিন্থেটিক স্পেসেই।

মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন-এর ধারণা একটা আনইকুয়াল এক্সচেঞ্জ বা অসম বিনিময়কে হাজির করে। কিন্তু মার্ক্সবাদী আলোচনায় আমাদের পরিচিত বিষয় 'আনইকুয়াল এক্সচেঞ্জ' যা দিয়ে উন্নত প্রথম বিশ্ব আর অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের বিনিময়কে বোঝানো হয়, তার মত অতিনিয়ন্ত্রণের অভিনয়ের অসম বিনিময় পরিমাণগত নয়, গুণগতভাবে অসম একটা বিনিময়। একটা কোয়ালিটেটিভলি আনইকুয়াল এক্সচেঞ্জ। এই অসম বিনিময়টা ঘটে দুটো ভূমির মধ্যে। যাকে বুঝতে আমাদের মেটাফর এবং মেটোনিম-এর ধারণাটা থাকা দরকার। অত্যন্ত সংক্ষেপে মেটাফর এবং মেটোনিম-এর সংজ্ঞাটা দিয়ে নেওয়া যাক। মেটাফর এবং মেটোনিম দুই-ই হল পরিবর্তিত উপস্থিতির চিহ্ন। শুধু দুজনে দুরকম পরিবর্তনকে সূচিত করে। যখন একটা অচেনা সত্তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা তলে পরিচিত চেহারায় হাজির করা হয় তাকে বলে মেটাফর। ধরুন তাসের দেশের বিদেশী রাজপুত্র। পূর্বের অনড় অচলায়তনে পশ্চিমের নবজাগরণ আলোকপ্রাপ্তির অগ্রদূত হয়ে এল বিদেশী রাজপুত্র। রাজপুত্র তাই এনলাইটেনমেন্টেরই একটা ভিন্ন মুখ ভিন্ন অবয়ব, এমন একটা মুখ

যা ধারণা হিশেবে আমাদের অপরিচিত নয়, বিদেশী রাজপুত্র তো সবাই কত দেখেছে। বিদেশী রাজপুত্রের মত যে কোনো মেটাফরই চেনা সত্তা দিয়ে অপরিচিত অচেনা সত্তাকে হাজির করে তাকে স্বপ্রকাশ করে তোলে। আর, কোনো সত্তা যখন তার নিজেরই একটা অংশ দিয়ে নিজেকে হাজির করে তাকে বলে মেটোনিম। মেটোনিমিক উপস্থিতি হল একটা সত্তার একটা খণ্ডীকৃত খর্বীকৃত উপস্থিতি। মেটোনিমটুকু বাদ দিয়ে সত্তার অপরাপর অংশ গোপন থাকে মেটোনিমে। যেমন, ভরত রামের বদলে রামের জুতো রেখে দেশ শাসন করল। রামের জুতো এখানে রামের পূর্ণ উপস্থিতির মেটোনিম। এখানে আরো একটা কথা বলার আছে। আমরা আমাদের তত্ত্বে যেভাবে মেটাফর বা মেটোনিমকে ব্যবহার করি তা ইংরিজি ব্যাকরণের অলঙ্কার হিশেবে মেটাফর আর মেটোনিম-এর ধারণার চেয়ে বেশি কাছাকাছি আসে লাকাঁর তত্ত্বের মেটাফরিক কাট এবং মেটোনিমিক স্লাইডিং-এর ধারণার।

এখানে সেই তাত্ত্বিক জটিলতায় না গিয়ে বরং একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে পশ্চিম আর পূর্বের পারস্পরিক বিনিময়ের অসাম্যটা দেখানোর কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। পশ্চিমের বিদ্যাচর্চা পশ্চিমের সঙ্গীত প্রতিনিয়ত আমাদের সংস্কৃতির ধারাগুলোকে প্রভাবিত করছে প্লাবিত করছে, আবার আমাদের বিদ্যা ও সঙ্গীতও পশ্চিমে পৌঁছচ্চে, মানে পৌঁছতে তাকে হচ্ছেই এমনকি দেশেও গৃহীত হওয়ার জন্যে — এ আমরা সবাই জানি। এবার পূর্বের আর পশ্চিমের সম্পর্কটাকে যদি আমরা একটা অতিনির্ণয় বলে ভাবি তাহলে বিপরীতমুখী স্রোতদুটো কী কী? লক্ষ্য করুন, অতিনির্ণয়ের আপাতসাম্যের ভুবনেও পশ্চিম আমাদের যেভাবে অতিনির্ণয় করে আমরা তাকে সেভাবে করিনা। পূর্বের শিল্পীদের অ্যাকাডেমিকদের পূর্বের সঙ্গীত ও বিদ্যাকে নিজেদের জ্যান্ত শারীরিকতায় হাজির করে দিতে হয় পশ্চিমের অডিটোরিয়ামে আর ইউনিভার্সিটির করিডোরে, তাদের পরিচিত পৃথিবীতে পরিচিত অবয়বে। অন্যদিকে পশ্চিম পূর্বে এসে পৌঁছয় খণ্ডীকৃত খর্বীকৃত চেহারায়। শিল্পীদের জায়গায় আসে তাদের মিউজিক ভিডিও, অ্যাকাডেমিকদের বদলে আসে তাদের পেপার — পূর্বের সঙ্গে বিনিময়ে এটাই কাফি। বিষয়টা অনেকটা এইরকম — ধরুন, ভূমি ক থেকে ভূমি খ-তে যাচ্ছে তার সত্তাদের উদ্বৃত্ত মেটোনিমিক অর্থ (পশ্চিম থেকে পূর্বে আসে মেটোনিমিক সারপ্লাস) আর ভূমি খ থেকে ভূমি ক-তে যাচ্ছে তার সত্তাদের উদ্বৃত্ত মেটাফরিক অর্থের প্রবাহ (পূর্ব থেকে পশ্চিম)। এই অবস্থায় আমরা বলব, ভূমি খ ভূমি ক-র বশীকরণে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। একটা হেজেমনিক অর্ডার কাজ করছে এই অতিনিয়ন্ত্রণের ভিতরেও। ক এবং খ-এর পারস্পরিক অতিনিয়ন্ত্রণের ভিতরেই হাজির থাকছে ভূমি ক-এর এই বশীকরণ, অতিনিয়ন্ত্রণের আপাতসাম্যের মায়াকে ভেঙে। এই অবস্থাটাই অতিনিয়ন্ত্রণের অভিনয় বা মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন বলে ডেকেছি আমরা।

মেটাফর আসলে চেনা চেহারায় অচেনা অর্থকে হাজির করে, এবং এই ভাবে যা অপ্রকাশিত তাকে প্রকাশিত করে তোলে। আর, মেটোনিম, খণ্ডীকরণ এবং খর্বীকরণের মধ্যে দিয়ে, প্রকাশিত সত্তার যেটুকু সে হাজির করল তার মেটোনিমে, মানে, একটা বিশেষ অংশকে বাদ দিয়ে, অন্যান্য অংশকে গোপন করে। তাই, অতিনিয়ন্ত্রণের এই অভিনয়ে, ক আর খ এই দুই পক্ষের দরকষাকষিতে খ সবসময়েই আরো আরো প্রকাশিত হয়ে হাজির হয় ক-তে। খ-এর উদ্বৃত্ত অর্থদের প্রকাশ্য উপস্থিতির সঙ্গে কথোপকথনে আসতে পারে ক, নিজের অপর বা আদারকে সবসময়েই আরো আরো স্পষ্টভাবে চিনে নিতে পারে। আর উল্টোদিকে খ নিজে স্পষ্ট করে জানেও-না ক-এর উদ্বৃত্ত অর্থরা তাকে ঠিক কিভাবে প্লাবিত করছে প্রভাবিত করছে। ক-এর গভীর গোপন এই উপস্থিতিকে নিজের অচেতনে আনকনশাসে বহন করে চলে খ। ক-এর উদ্বৃত্ত অর্থের মেটোনিমরা এবার খ-এর নিজস্ব অর্থ-নির্মাণ প্রক্রিয়ার গোপন অভ্যন্তরে উপস্থিত থেকে তাদের ভাঙচুর, তাদের সাবভার্শন চালিয়ে যেতে পারে, খ আর তা টের-ও পায়-না।

আমরা প্রথমেই বলেছিলাম বড্ড বেশি উদার রকমে তাত্ত্বীকৃত মিশ্রভূমি বা হাইব্রিড স্পেসে দিয়ে কমপ্লেক্স থার্ড সিন্থেটিক সবরকমের স্পেসকেই ভাবা যায়। এবং এর মধ্যে সিন্থেটিক স্পেস এর ধারণাই, একমাত্র, মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশনকে বোঝার সুযোগ দেয়। এবং মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশনে, এইমাত্র আমরা যা দেখলাম, অতিনিয়ন্ত্রণের অভিনয়ে ক্ষমতার এই নিয়ন্ত্রণ চলে একটা ক্ষুদ্রতর ভূমি বা সাবস্পেস জুড়ে, অন্য অনেকটা জায়গা জুড়ে খেলা করে অতিনিয়ন্ত্রণ।

অতিনিয়ন্ত্রণের শর্ত হিশেবে আমরা বলেছিলাম যে, এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি সত্তা অন্য প্রতিটি সত্তাকে নির্ণয় ও নির্মাণ করে। নির্ণয় ও নির্মাণের এই পারস্পরিক প্রক্রিয়া, যাকে আমরা পারস্পরিক বিনিময় বা রেসিপ্রোকাল এক্সচেঞ্জ বলে ডাকি — তার ভিতরেই একটা ক্ষুদ্রতর জায়গা থেকে গজিয়ে ওঠে গুণগতভাবে পৃথক দুটি নির্ণয় (খ ক-কে, এবং, ক খ-কে), তৈরি হয় আনরেসিপ্রোকাল এক্সচেঞ্জ বা অপারস্পরিক বিনিময়। অপারস্পরিক বিনিময়ের এই ক্ষুদ্রতর ভূমি বা সাবস্পেসে একটি উপাদান উপরে থাকে, অন্যটি মানে তার অপর বা আদারটি থাকে নিচে। এবং অতিনির্ণয়ের প্রক্রিয়ার ভিতরেই একটা ছোট্ট জায়গায় বসে একটা বিদ্রূপ চালিয়ে যেতে থাকে অতিনির্ণয়ের প্রতি, পারস্পরিক বিনিময়ের প্রতি। কিন্তু তাই বলে অতিনির্ণয়ের, পারস্পরিক বিনিময়ের বৃহত্তর প্রক্রিয়াটা যে পরিত্যক্ত হয় তা নয়। সেই বৃহত্তর স্পেস-এর ভিতরেই কাজ করে চলে এই সাবস্পেস।

৯।। কান্ট এবং ফুকো

অতিনিয়ন্ত্রণের অভিনয়ের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিক তলে আমরা একটা খুব বড় বদল ঘটিয়ে ফেলতে পারলাম। অতিনিয়ন্ত্রণের অভিনয়-এর ধারণা হেজেমনিক পাওয়ার বা নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতাকে তার এসেনশিয়ালিস্ট কাঠামো থেকে বাইরে বার করে আনল। ফুকো হেজেমনিক ক্ষমতাকে যেভাবে দেখেছিলেন তার মধ্যে এই সারবাদী এসেনশিয়ালিস্ট জায়গাগুলো রয়ে যাচ্ছিল। কালচার স্টাডিজ-এর প্রচলিত ঘরানাগুলোয় হেজেমনিক ক্ষমতাকে দেখা এবং দেখানো হয় অনেকটাই ফুকোর দৃষ্টিতে। তাই এক অর্থে, চালু উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক সংস্কৃতিবিদ্যার তত্ত্বের জগতে এটা একটা বড় হস্তক্ষেপ। এই কাজগুলোয় ক্ষমতাকে সবসময়েই দেখা হয় ডিসকোর্সের বা আলোচনার বাইরে থেকে প্রযুক্ত একটা পদ্ধতি হিশেবে। (একটু আগে লাকলাউ মুফের ক্ষেত্রে আমরা যেমন বলেছিলাম, পুরো বস্তুজগতের ঘটনাগুলোকে তাদের বিভিন্ন সিগনিফায়ার বা দ্যোতক মারফত একটা আলোচনার তলে নিয়ে আসা হয়, এবং সেই আলোচনা বা ডিসকোর্স নামক ভূমির গতিপ্রকৃতি হিশেবে ইতিহাসের বদলগুলোকে বিবৃত ও ব্যাখ্যা করা হয়। এটাকেই বলে ডিসকার্সিভ স্পেস বা আলোচনাগত ভূমির সাপেক্ষে তাত্ত্বীকরণ। সব জ্যান্ত প্রক্রিয়াকেই এরা তাদের নির্মিত দ্যোতকদের নিরিখে একটা আলোচনাগত ভূমি হিশেবে দেখেন এবং সেভাবেই তাদের বিচারবিশ্লেষণ করেন।) ফুকোপন্থী এই সংস্কৃতিবিদরা ক্ষমতা বা পাওয়ারের উৎসকে সবসময়ই এক্সট্রা-ডিসকার্সিভ বা আলোচনার ভুবনের বাইরে থেকে আসা বলে মনে করেন। তাই তারা তাদের মনোনিবেশ করেন সেইসব প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউশনগুলোর উপর যেখানে নিয়ন্ত্রণকারী আলোচনা বা হেজেমনিক ডিসকোর্স নির্মিত হয়ে চলেছে। যারা ক্ষমতাকে রূপান্তরিত করছে এবং প্রবেশ করাচ্ছে আলোচনাগত ভুবনে, ডিসকার্সিভ প্লেনে। ক্ষমতার প্রয়োজন মোতাবেক নতুন নতুন বদল ঘটিয়ে চলেছে তারা ডিসকোর্সের বা আলোচনার তলে। মানে, সংস্কৃতিতে রাজনীতিতে অর্থনীতিতে — তারা প্রত্যেকেই তো এখন এক একটা আলোচনাগত পদ্ধতি। (আলোচনার উপর ক্ষমতার শাসন নিয়ে, অর্ডার অফ ডিসকোর্স নিয়ে, বা এই জেলখানা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল ইত্যাদির মারফত সেই শাসন কিভাবে লাগু করা হয় তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমরা অন্য প্রবন্ধে আগেই করেছি। বইমেলা ২০০১ অপর।)

এবার, এই ইন্সটিটিউশন বা প্রতিষ্ঠানগুলোর মারফত এই হেজেমনিক ডিসকোর্স নির্মিত হওয়ার পর কী করে তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, কী করে নিজের বীজ রোপন করে দেয় সারা বাস্তবতা জুড়ে — সেই ডিসেমিনেশনটাই খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন এই কালচার-স্টাডিজওয়ালারা। খোঁজেন সেইসব প্রাতিষ্ঠানিক আচারের রীতিবিধি যা দিয়ে আলোচনাগত ভূমিকে আবদ্ধ করা হয়, তার উপর নিয়ম নিগড় চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিভাবে একটা ডিসকোর্স বেড়ে উঠবে সেটাকেই স্থির করে দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র করে এই লড়াইকে খুঁজে দিয়ে তারা ক্ষমতার মুহূর্তগুলোকে চিহ্নিত করেন।

ক্ষমতার উৎস বলে কিছু আছে এই কথা যদি আমরা মানি তো এইভাবে অবশ্যই ক্ষমতার গতিকে অনেকটাই বোঝা যায়, দেখানো যায় ক্ষমতার উৎসকে, সোর্স অফ পাওয়ারকে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু আমরা আমাদের তত্ত্বে তো ক্ষমতার উৎসকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টাই করছি-না। ওই এসেনশিয়ালিস্ট

গেছোদাদার পিছনে দৌড়ে বেড়ানোর আমাদের কোনো স্পৃহাই নেই। বরং, আমরা চাইব ক্ষমতার গতিপথের সঞ্চার এবং দিকনির্দেশটাকে খুঁজে পেতে, পাওয়ারের লোকাস এবং ডিরেকশন। তার আগে, প্রথমেই আমরা জানতে চাইব, হেজেমনিক পাওয়ার বা নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা কাকে বলে? এবং, তারপর, সজোরে আমরা ঘোষণা করব, নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা কখনোই এক্সট্রা-ডিসকার্সিভ বা ডিসকোর্সের ভুবনের বাইরে থেকে আগত আগন্তুক নয়, হেজেমনিক ক্ষমতা বসবাস করে ডিসকোর্সের ভুবনেই। শুধু তার ছদ্মবেশ খুলে তাকে চিনে নেওয়া দরকার। এবং অতিনিয়ন্ত্রণের অভিনয় ঠিক এটাই করে। ডিসকোর্সের বাইরে থেকে আগত ক্ষমতার প্রবেশের প্রসঙ্গটা আসে আলোচনার বা ডিসকোর্সের অনেক পরের একটা স্তরে, অন্য একটা প্রক্রিয়াকে দেখাতে গিয়ে। যে প্রক্রিয়া দিয়ে আলোচনার জগতের উপর ক্ষমতা বা পাওয়ার নিজেকে আর একবার ঘোষণা করে, আলোচনার আত্তীকরণ করে এবং আলোচনার জগতে নিজের পছন্দ অনুযায়ী ক্ষমতা বন্টন করে। অর্থাৎ, আলোচনার মধ্যে পাওয়ার প্রথম থেকেই থাকে, সেই ক্ষমতার ব্যাকরণ মোতাবেক গজিয়ে উঠতে থাকে আলোচনা। পরে, একটা সময়ে, আলোচনার নির্মাণ যথেষ্ট এগিয়ে যাওয়ার পরে, ক্ষমতা আবার নিজেকে ঘোষণা করে, আলোচনার জগতের সভ্যদের গ্রহণ বা বর্জন করে, আলোকিত করে বা অন্ধকারে নিয়ে যায়, প্রবেশ ঘটায় বা বহিষ্কার করে, বা, এমনকি, যার প্রবেশ ঘটতে দেয় তাকেও বদলে দেয়। এবং এই পুরো প্রক্রিয়াটা দিয়ে আলোচনার জগতের কিছু কিছু অংশকে নিজের করে নেয়, এবং সেই মোতাবেক ক্ষমতার প্রসাদ বাঁটোয়ারা করে।

ফুকোর দৃষ্টিতে কিন্তু পাওয়ার বা ক্ষমতা সর্বব্যাপী এবং সর্বত্রগামী, অনেকটা ঈশ্বরের মত। আমরা এভাবে ভাবিনা। আমরা মনে করি, ক্ষমতার খুব স্পষ্ট কিছু সীমা বা লিমিট আছে। এবং, ক্ষমতার দৃষ্টির, প্রহরার, গেজ-এর, প্যানঅপ্টিকনের বাইরে প্রসারিত একটা জমি আছে, পৃথিবী আছে। যেহেতু ফুকো তার পাওয়ার বা ক্ষমতাকে সংজ্ঞা দিতে যাননি এবং খোলা ছেড়ে দিয়েছেন, সংজ্ঞাহীন এবং অনির্দিষ্ট, আনডিফাইন্ড এবং ইনডেফিনিট, তাঁর দৃষ্টিতে ক্ষমতাও অনন্ত, সীমাহীন হয়ে গেছে। ফুকোর তত্ত্বে আলোচনাই ক্ষমতা, জ্ঞানই ক্ষমতা, ডিসকোর্সই পাওয়ার। আমরা এই অবস্থানের সঙ্গে নিজেদের অনৈকমত্য জানাই। আমাদের মতে, ক্ষমতা জন্মই নেয় ডিসকোর্সের অভ্যন্তরে এবং আমরা সুনির্দিষ্ট রকমে দেগে দিই, চিহ্নিত করি, ডিসকোর্সের অভ্যন্তরে ঠিক কোথায় কখন কিভাবে ক্ষমতার জন্ম হয়। এবং যেহেতু ফুকো ডিসকোর্সের অন্দরে আঁতুড়ঘরে ক্ষমতার জন্মকে চোখে দেখতে পান না, তাই এর মৃত্যুটাও তাঁর নজর এড়িয়ে যায়। শুরুটা দেখতে পাননি বলে ক্ষমতার শেষটাও তাঁর দেখার বাইরে রয়ে যায়। আমাদের কাছে পাওয়ার অনেকটা ডিসকোর্সের মহাসাগরে এক একটা তরঙ্গের মত। মহাসমুদ্রটা নিজে কিন্তু ক্ষমতা নয়। সমালোচনা তাত্ত্বিকের, ক্রিটিকাল থিয়োরিস্টের দায়িত্ব এবার ক্ষমতার সঞ্চারপথটাকে বিবৃত করা, কী পথ বেয়ে ক্ষমতা শুরু হল, গড়ে উঠল, বেড়ে উঠল, এবং কোথায় সেটা শেষ হল। এবং কোথায় কোথায় সেটা বদলাল, কোথায় কোথায় ক্ষমতার এই প্রবাহটা ভেঙে গেল সেটা দেখানোর দায়িত্ব-ও ওই সমালোচনা-তাত্ত্বিকেরই। ফুকো একাধিকবার আলোচনা করেছেন ক্ষমতার নিজের এলাকার ভিতর প্রান্তিক অঞ্চল বা মার্জিন নিয়ে, ক্ষমতার প্রভাবের ধূসর অঞ্চল নিয়ে, খুব স্পষ্ট সাদা কালো অক্ষরে যেখানে ক্ষমতাকে আর চিহ্নিত করা যায় না। কিন্তু একবারো ক্ষমতার বাহির বা আউটসাইড নিয়ে কোনো প্রসঙ্গ আনেন-নি। ক্ষমতার সঙ্গে কোনো কথোপকথন কোনো প্রতিপ্রাপকতাই নেই ডিসকোর্সের এমন কোনো জায়গা নিয়ে ফুকো কোনো কথা বলেননি। (যাকে লাকীয় ভঙ্গীতে 'আনসেইড' বা 'অকথিত' বলে অভিহিত করা যায়।)

অকথিত বাহির বা আনসেইড আউটসাইডের এই অঘোষণা, তার প্রতি একটা স্বতঃবিস্মরণ, ফরগেটফুলনেস — এটা ফুকোর উচ্চারিত নব্যকান্টবাদ বা নিয়োকান্টিজম-এর ভিতর গোড়া থেকেই আছে। খুবই স্পষ্ট এবং দ্বিধাহীনভাবে। কান্টের দর্শনে নবজাগরণবাদী যুক্তির (এনলাইটেনমেন্ট রিজন উইথ এ ক্যাপিটাল আর) যে সীমা বা লিমিটগুলো চিহ্নিত হয়েছিল তাদের অস্থায়ী এবং পরিবর্তনযোগ্য করে দিয়েছিল ফুকোর নব্যকান্টবাদ। কান্টের আদত দর্শনে সীমাগুলো ছিল প্রদত্ত এবং অপরিবর্তনীয়। যাতে কেউ কিছু বললে অন্যের কাছে তার অর্থ বোধগম্য হয়। চিন্তার ধারণার বোধের জ্ঞানের একটা সীমা। আপনার অভিজ্ঞতার ইতিহাস আমার অভিজ্ঞতার ইতিহাস থেকে আলাদা, তাও, আপনার বলা শব্দের অর্থ আমি

ধরতে পারছি মানেই মোটের উপর মানুষের অভিজ্ঞতার চিন্তার বোধের কতকগুলো সীমা আছে — অসীম একটা ভূমিতে আমরা কেউই তো অন্য কাউকে খুঁজে পেতাম না। এই সীমাগুলো যদি না-থাকত, প্রত্যেকের জ্ঞান ধারণা বোধ অন্য প্রত্যেকের জ্ঞান ধারণা বোধের থেকে আলাদা আলাদা স্তরে কাজ করত, এবং প্রত্যেকেই অন্য প্রত্যেকের কাছে অবোধ্য হয়ে উঠত। কিন্তু এই নিওকান্টিয়ান মতবাদেও, যদিও এই সীমাগুলো পরিবর্তনযোগ্য, তারা কিছুতেই পরিহারযোগ্য নয়। তারা ডিসপোজেবল নয় কিছুতেই। তাদের ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না। বদলাচ্ছে বটে, কিন্তু সীমা একটা থাকছেই। এবং ফুকোর তত্ত্বকাঠামোতেও, এই প্রাচীন কান্টীয় নিদানকে ভেঙে ফেলা হয়নি। কান্টের 'থিং-ইন-ইটসেল্ফ'-এর সেই ধারণা যাকে আমরা বাহির বা আউটসাইড বলে ভাবতে পারি — তাকে আমরা কখনোই বিবৃত করতে পারিনা। বোঝাতে পারিনা। উপস্থাপিত করতে পারিনা। ফুকো যুক্তিবোধের এবং যুক্তিচর্চার সেই কান্টীয় সীমাগুলোকে আরো ঠেলে বাড়িয়ে তুলেছেন, বাইরের দিকে নিয়ে গেছেন যাতে আউটসাইডের একটা অংশকে তিনি ক্রমক্ষীয়মান ক্ষমতার মার্জিনে নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু যে বাহির অন্দরে চলে এল, হোক ধূসর তবু তো সেটা ক্ষমতার জগত, তা তো আর বাহির নেই, অন্দর হয়ে গেছে। ফুকো তাই তার তত্ত্বকাঠামোয় ডিসকার্সিভ স্পেসে ক্ষমতার কোনো আউটসাইডকে খুঁজে পাননি।

মার্জিনের বা প্রান্তিক অঞ্চলের এই সংনম্যতা বা পরিবর্তনযোগ্যতা নিশ্চিত করে যে আউটসাইড গিয়ে জড় হবে ওই মার্জিনে, কিন্তু সেই জড় হওয়াটা কখনোই মার্জিন বা আউটসাইডকে কোনো মৌলিক বদল ঘটাবে না। মার্জিন বা আউটসাইড রয়ে যাবে হুবহু একই চেহারায় ও চরিত্রে। মার্জিন মানেই যে কণ্ঠস্বর ইতিমধ্যেই গৃহীত ও অনুগৃহীত হয়ে গেছে, এবং আউটসাইড মানেই তাই যাকে কোনোদিনই ডিসকোর্সের অন্তর্ভুক্ত করা যাবেনা, ডিসকোর্সে যার কোনোদিনই কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকবে না। ফুকোর তত্ত্বে, একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে, সময়ের একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে আমরা সবসময়ই একটা সীমান্ত বা বর্ডার খুঁজে পাব, যে বর্ডার অফ ডিসকোর্স খুব নিখুঁত ভাবে অন্তর্ভুক্তি আর বহিষ্কারের সীমাগুলোকে মেনে চলবে। ইনক্লুশনের এবং এক্সক্লুশনের বাউন্ডারিগুলোকে। অন্তর্ভুক্তির মধ্যে পড়ছে কেন্দ্র ও পরিধি, সেন্টার ও মার্জিন। আর বহিষ্কৃত থাকছে আউটসাইড। ফুকো তার তত্ত্বে এই বর্ডারটাকে আরো আরো প্রসারিত করে তুলে আরো আরো আউটসাইডকে ইনসাইড বা অন্দর করে তোলায় রাজি, কিন্তু ওই বর্ডারের ধারণাটাকে ফেলে দিতে রাজি নন। আর, বর্ডার থাকা মানেই তো একটা আনসেইড আউটসাইড থেকে যাওয়া।

আমাদের কাছে ডিসকার্সিভ কাঠামোটা ফুকোর থেকে আলাদা। এখানে মার্জিনকে অনেক স্পষ্ট এবং জোরালো একটা জায়গা দেওয়া হয়। আমাদের মডেলে আলোচনাগত ভূমির স্পষ্ট মার্জিনটা কেন্দ্র এবং বাহির, সেন্টার এবং আউটসাইডের সাথে শুধু যে সহায়তা বা প্রতিরোধের, কোলাবোরেশন বা রেজিস্টান্সের সম্পর্কে আসতে পারে তাই নয়, এখানে একটা অতিনির্ণয়ও আছে। সেন্টার এবং আউটসাইডের সঙ্গে আমাদের মার্জিন উভয়মুখী নির্মান ও নির্ণয়ের সম্পর্কে রয়েছে, মানে ওভারডিটারমিনেশনে। যদিও, মাথায় রাখবেন, এই আউটসাইডের যে কণ্ঠস্বরকে আমরা খুঁজে পাব মার্জিনে, সেই স্বর অত্যন্ত দুর্বল, প্রায় শোনার বাইরেও হতে পারে। কিন্তু তবু তা আউটসাইডের কণ্ঠস্বর। আউটসাইড নিজেকে চিহ্নিত রাখবে কাঠামোর ভিতরেই, যা ফুকোর মডেলে সম্ভব ছিলনা। এই খুব মিনমিনে এবং দুর্বল কণ্ঠস্বর নিয়েও যখন সে শেষ অব্দি কথা বলে ওঠে — কেন্দ্রের সেটা না-শুনে আর কোনো উপায় থাকেনা — আউটসাইডের সেই কথা-বলে-ওঠার অন্য নাম সিম্পটম বা রোগলক্ষণ। ফুকোর তত্ত্বে আলোচনার শাসন বা অর্ডার অফ ডিসকোর্স গড়ে উঠছে গড়ে উঠছে একটা সীমান্ত বা বর্ডার ধারণাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ফুকো বুঝে উঠতে পারেননি কিভাবে আলোচনার শাসন এই সীমান্ত পেরিয়ে উপচিয়ে যায় বাহিরে, আউটসাইডে। কিন্তু সেই যাওয়াটা গোপনে, অদৃশ্যে। ফুকোর ওই 'সীমান্ত' বা 'বর্ডার' — যে ধারণাটায় কান্টের উত্তরাধিকারটা খুব স্পষ্ট — সীমান্তটা কিন্তু আদৌ নিশ্ছিদ্র বা অভেদ্য নয়, বা কোনো সময়েই সেরকম ছিলনা। বাহির বা আউটসাইডকে অজ্ঞেয় বলে মনে করাটা আসে এই সীমান্ত ধারণাটাকেই জোরদার করতে। এবার, যেই বর্ডারটা আর নিশ্ছিদ্র রইল না, মানে, বাহির আর সম্পূর্ণ

অজ্ঞেয় বা আননোএবল রইল না, ফুকোর, বা সেই অর্থে, কান্টের, এই সীমান্ত ধারণাটাও ঝটকে যেতে বাধ্য।

ডিসকোর্সের জগতে কিভাবে শাসন কাজ করে, কিভাবে গড়ে ওঠে 'শাসিত আলোচনা' বা 'অর্ডার্ড ডিসকোর্স' এবং তাকে ঘিরে ক্ষমতার কৃৎকৌশল, সেটারই বিবরন দিয়েছেন ফুকো তার অর্ডার অফ ডিসকোর্স-এ। বহিষ্কারের নীতি সেখানে কিভাবে চারিয়ে যায় এবং কাজ করে, ফলতঃ আলোচনার সম্পূর্ণ জগতটার উপর ক্ষমতা তার শাসন জারি রাখতে পারে — সেগুলো দেখিয়েছেন। অর্ডার অফ ডিসকোর্স-এ ফুকোর তাত্ত্বিক ছকে ফুকো ডিসকোর্সকে দেখেছেন দুটো বিরুদ্ধ প্রবণতার পারস্পরিক ক্রিয়ায় নির্মিত হয়ে উঠতে। এই প্রবণতাদুটো হল — এক, মুক্ত আলোচনার আকাঙ্খা। একটা ডিজায়ার যা সবসময়েই চায় ডিসকোর্সের উপর কোনো নিয়ম বা বন্ধন আর না-থাকুক, ডিসকোর্স হোক অনন্ত রকমের মুক্ত। আর, দুই, এর ঠিক বিপরীত প্রবণতাটা আসে প্রতিষ্ঠানগুলোর তরফে, তারা বিভিন্ন প্রতিবন্ধক দিয়ে ডিসকোর্সকে আবদ্ধ করে ক্ষমতার কাঙ্খিত কাঠামোয়। বাসনা এবং প্রতিষ্ঠান — এই দুটো প্রবণতা একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। এদের দুজনকে ঘিরেই গড়ে ওঠে বেড়ে ওঠে ডিসকোর্স। বাসনা তাড়িত করে লিখে-চলাকে, বা, শুধু লেখা কেন, ডিসকোর্স গড়ে ওঠার যে-কোনো মাধ্যমকেই। আর, এর উল্টোদিকে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার শাসন, যা লিখে-চলার সেই তাড়নাকে সেন্সর করে, ছাঁটকাট করে, এবং নিজের প্রভুত্ব জারি করে। ফুকোর মতে এই প্রভুত্ব জারি করাটা আসতে পারে তিন ভাবে।

এক, নিষেধ এবং বহিষ্কারের সামাজিক পদ্ধতি — যা দিয়ে শাসিত হয় যৌনতা রাজনীতি ইত্যাদির নিষিদ্ধ আলোচনা। যুক্তি এবং পাগলামির পার্থক্য, সত্য এবং মিথ্যার তফাত — যা দিয়ে ঠিক হয় কোনটা জ্ঞান এবং কোনটা জ্ঞান নয় আর সেই জ্ঞানটা সমাজে কিভাবে ব্যবহার হবে — এই পুরোটাই নিয়ন্ত্রিত হয় নিষেধ এবং বহিষ্কারের ওই সামাজিক পদ্ধতি দিয়ে।

দুই, এরপর যেই সেই ডিসকোর্স ছড়িয়ে যায় সাধারণ্যে, আসে অর্থের উপর যুগ্ম চালুনির শাসন — সমালোচক এবং পাঠক, তাদের দুজনের স্তরেই দুবার অর্থের পরিস্রাবণ হয়, ডাবল সেন্সরিং। স্তরে স্তরে এই প্রক্রিয়ায় অর্থের ভাণ্ডার আসে খাটো হয়ে ছোট হয়ে। অর্থনির্মাণের ক্ষমতাটাই তার কুঁকড়ে যায়। (যার ফুকোবাদী নাম রারেফ্যাকসিয়ঁ বা ইংরিজি রেয়ারিফ্যাকশন। এই ধারণাটার অর্থ, মূল তরঙ্গটার শক্তি গতি প্রসার সবই কম করে নিয়ে তাকে একটা মাধ্যমে প্রবেশ করতে দেওয়া। যে কারণে লঘু থেকে ঘন মাধ্যমে যাওয়ার সময়ে, যেমন হাওয়া থেকে কাঁচে বা হাওয়া থেকে জলে, আলো বেঁকে যায়। আলোকতরঙ্গের শক্তি কমে যায় বলেই সে লম্বের দিকে ঝুঁকে আসে। বেঁকে যায় আলোকরশ্মির গতিমুখ, তাদের প্রতিসরণ ঘটে, রিফ্র্যাকশন।) ডিসকোর্সের কষ মেরে দেওয়া হয়, ঝুলে যায় ডিসকোর্স, কিছু করার তাগত ফিনিশ করে দেওয়া হয়, নতুন অর্থ প্রজননের ক্ষমতা চলে যায় তার। এই রারেফ্যাকসিয়ঁ ফুকোর খুব প্রিয় কনসেপ্ট, কাজের কনসেপ্ট ।

তিন, আর এদের সবার উপরে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে প্রতিষ্ঠানগুলোর সদাসতর্ক অতন্দ্র প্রহরা, প্যানঅপ্টিকন। পিএইচডি-রত গবেষকের সুপারভাইজর, বিভিন্ন জার্নালের সম্পাদক বোর্ডগুলো মিলে হাতে ডান্ডা নিয়ে খাড়া — কোন গবেষণা গবেষিত হবে, কোন টেক্সট ছাপা হবে। এরা সবাই মিলে চালিয়ে নিয়ে যায় ডিসকোর্সকে ক্ষমতার আত্তীকরণের পদ্ধতি, সময় থেকে সময়ে প্রয়োজন থেকে প্রয়োজনে ক্ষমতার কাঙ্খিত ছকে ছোট ছোট বদল ঘটায়। আর এর ভিতর দিয়ে তৈরি হয় জ্ঞানের স্বীকৃত কাঠামো, স্বীকৃত জ্ঞানের কাঠামো।

এখানে ফুকোর অর্ডার অফ ডিসকোর্সের ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণের এই ছকের সঙ্গে পরবর্তী কালের তাঁর কান্ট এবং এনলাইটেনমেন্ট নিয়ে অন্যান্য লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখাটা খুব জরুরি। ফুকো কান্টকে দেখাচ্ছেন একজন মাফিয়া গডফাদার হিশেবে। আমাদের চারপাশে, ডিসকোর্সের ওই অভিভাবকদের এবং অ্যাকাডেমির ওই দারোয়ানদের, যারা ঠিক করে দেয় আমরা কী লিখব কী আঁকব কী ছবি তুলব বা কী জানব, সেই কুচো কুচো প্রভুদের আদি পূর্বপুরুষের আকারে তিনি দেখছেন কান্টকে। কান্ট দর্শনের বিদ্যাচর্চার ডিসকোর্সের সীমা ঠিক করে দিয়েছিলেন, যাতে দার্শনিক যুক্তিসিদ্ধ রকমে কথা বলতে পারেন, ডিসকোর্স

গড়তে পারেন। দার্শনিকদের তিনি শিখিয়েছিলেন, শমদমাদি সাত্ত্বিক গুণে অবস্থিত থাকতে, মানে প্রশমিত থাকতে, দমন মেনে নিতে, ওই পূত পবিত্র সীমা ভাঙার পাগলামো ছেড়ে পরিমিত থাকতে। (শমদম-টা ঝাড়লাম গীতার অভ্যাসযোগ থেকে, গীতা আর এক কাঠামোয় হুবহু এই কথাই বলেছিল।) রিজন উইথ এ ক্যাপিটাল আর, মানে এনলাইটেনমেন্টের ম্যানুফাকচারিত সেই নতুন ঈশ্বরের অস্তিত্বের শর্তই হল ওই সীমার মধ্যে থাকা — কান্ট উবাচ। রিজন স্ফূরিত হয়, নির্মিত হয়, সক্রিয় হয় এবং পরিবর্ধিত হয় এই শর্ত মেনেই। তাই এই শর্ত আমাদের তত্ত্ববাজদের মানতেই হবে। কিন্তু কান্টের এই সীমা-বদ্ধ চেতনার তত্ত্ব ফুকোর সহ্য হল না।

কান্টকথিত এই সীমাগুলো ফুকোর কাছে আকস্মিক কাকতালীয় পরিবর্তনযোগ্য এবং অস্থায়ী বলে মনে হল, আমরা তো আগেই তা বলেছি। কান্টের যুক্তির সীমার নীতিকে মেনে নিলেন ফুকো, মানলেন না তার কাজ করার পদ্ধতি — যেভাবে তারা এই সামাজিক বাস্তবতাকে নিয়ন্ত্রিত করে বলে কান্ট ভেবেছিলেন, সেটাকে ফুকো মানলেন না। ফুকোর কাছে ডিসকোর্সের ওই সীমা এনলাইটেনমেন্ট রিজন, রিজন নামক ঈশ্বর, রিজন উইথ এ ক্যাপিটাল আর, থেকে প্রবাহিত হয়না। ওই সীমা প্রবাহিত হয় রক্তমাংসের জ্যান্ত দার্শনিকরা কিভাবে রিজনকে, যুক্তিকে বুঝছে, বোঝাচ্ছে এবং কাজে লাগাচ্ছে, তার থেকে। রিজনকে ঘিরে তাদের গোটা মনন এবং চিন্তন থেকে উদ্ভূত হয় ওই সীমা। এরা গজিয়ে ওঠে ক্ষমতা বা পাওয়ার থেকে, এবং নিজেরাও আবার ক্ষমতাকে গ্রথিত করে তার পরিবর্তমান অবয়বে, মানে, এরাই আবার পাওয়ারকে গজিয়ে তোলে। ফুকোর মতে, পোস্ট-এনলাইটেনমেন্ট যুক্তিচর্চার দায়িত্ব এবার এনলাইটেনমেন্ট রিজনের প্রতিষ্ঠানগুলোর আরোপিত এই সীমাগুলোকে ভেঙে দিতে থাকা। আর একটা তলে, দর্শনচর্চার আর একটা স্তরে, ফুকো যুক্তি দেখিয়েছেন যে কান্টকথিত এই সীমাগুলো কিন্তু কখনোই চূড়ান্ত না, বা সর্বতোভাবে অনস্বীকার্য না। তারা অস্থায়ী এবং পরিবর্তনযোগ্য। তারাই যে শুধু যুক্তিবোধের অস্তিত্বের শর্ত তাই নয়, যুক্তিবোধ-ও তাদের অস্তিত্বের একটা শর্ত। রিজন বা যুক্তিবোধ এবং এই সীমাগুলো এ অন্যকে ছেড়ে বাঁচতে পারেনা। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটার শরীরে ঘটা বদল অন্যটার শরীরে স্থানান্তরিত হবেই।

ফুকোর কমবয়সের লেখাগুলোয় এবং আর্কিওলজি অফ নলেজ-এ এই সীমাগুলোকে খুঁজে দেখার, তাদের যাচাই করে নেওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যায়। তাদের অস্তিত্বের শর্তগুলো কী কী, তাদের বদল অভিযোজন, তাদের গড়ে ও বেড়ে ওঠা, এবং তাদের অপনোদন — এই পুরোটাই বোঝার চেষ্টা করেছেন ফুকো, এই লেখাগুলোয়। বয়স্ক ফুকোয় এসে এখানে একটা বদল ঘটল। সেখানে ফুকো এই সীমাগুলোর ফলাফল বিচার করার চেষ্টা করেছেন। বিশেষতঃ তার ক্ষমতা সংক্রান্ত আলোচনা, পাওয়ার ডিসকোর্স। পরিবর্তনশীল মানবসমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ডিসকোর্সের উপর ক্রিয়াশীল এই সীমাগুলো, নিজেরাও কিভাবে বদলেছে এবং সেই সচল সীমাগুলো বাস্তব জ্যান্ত সমাজের উপর কী কী প্রভাব ফেলেছে — সেটাই দেখিয়েছেন।

পাওয়ার বা ক্ষমতা নিয়ে ফুকোর সমালোচনামূলক এবং ব্যাখ্যামূলক, ক্রিটিকাল, চিন্তাভাবনা সবসময়েই জোর দিতে চেয়েছে সেই রারেফ্যাকসিয়ঁ বা খর্বীকরণের পদ্ধতির উপর যা এই সীমাগুলোকে বানিয়ে তোলে। বহিষ্কৃত বা এক্সক্লুডেডকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিশ্রুত পুনর্বাসন দেওয়া হয় সমাজের অভ্যন্তরে। কুষ্ঠরোগী পাগল বাউন্ডুলে বজ্জাত অপরাধী — এদের সবাইকে প্রথমে বার করে দেওয়া হল সমাজ থেকে, তারপর আবার তাদের ফেরত আনা হল। এবার এই সেন্সরড বা পরিশ্রুত বহিষ্কৃতদের ফের আলোকপ্রাপ্ত এনলাইটেন্ড সমাজে প্রবেশের অধিকার এবং পুনর্বাসন দেওয়া হল। কিন্তু এই পুনর্বাসিত হতভাগারা আর কিন্তু তাদের পুরোনো চেহারায় নেই, তারা বদলে গেছে, খর্বীকৃত হয়ে গেছে। পুঁজি সমাজের ওয়েজ লেবারের আলোকপ্রাপ্ত সংস্কৃতিতে এবার তারা বেশ খাপ খেয়ে যায়। তারা আর আউটসাইড নেই, তারা এবার ইনসাইডেই জায়গা পেল, কেন্দ্রের মার্জিন হয়ে, এই মার্জিনাল বা প্রান্তিক মানুষেরা, এবং তাদের বাস্তবতা।

১০।। মার্জিন এবং আউটসাইড

ফুকোর দৃষ্টিতে এনলাইটেন্ড সমাজ মানে কেন্দ্র এবং প্রান্তে নিবদ্ধ একটা সীমাবদ্ধ কাঠামো। একটা ফাইনাইট কমপ্লেক্স। (এই 'কমপ্লেক্স' বা 'জট' নামক ধারণাটার ইতিহাস আবার ফুকোর মাস্টারমশাই আলথুসেরের তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেকশন এক-এ যা আমরা ছুঁয়ে এসেছি।) এবং, এই সীমা-অঙ্কিত জটিল কাঠামোয় সেন্টার আর মার্জিন দুই-ই খুব স্পষ্ট এবং এ অন্যের বিরোধী, দুটো মেরুর মত, বোধহয় এলিট আর সাবঅল্টার্নের, কুলীন এবং প্রাকৃতের মত। এবং আলোকপ্রাপ্ত এই ভুবনে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের পরিষ্কার কিছু নিয়মকানুন আছে, যা মেনে এই বাস্তবতায় কাউকে বা কিছুকে ঢুকতে দেওয়া হয়, এবং যা না-মানলে চারু কর্ণমর্দণে তাকে বার করে দেওয়া হয়। প্রবেশ মানে আউটসাইড থেকে ইনসাইড, আর নিষ্ক্রমণ মানে ইনসাইড থেকে আউটসাইড। আউটসাইড, বেচারা বাহির, এখানেও রয়ে গেল সেই আবহমান কান্টানুসারী অবয়বে। তাকে জানা যায়না, চেনা যায়না, দেখাও যায়না। অজ্ঞেয় নৈঃশব্দ্যের অন্ধকারে পতিত সেই বাহির বাহির থেকে জুলজুল নেত্রে অন্দরকে দেখে, ভিতরে হাসিছে মুখরা যামিনী দীপমালা সুখে গলায় পরিয়া, বাহিরে শিশির অশ্রুসজল বিষাদিনী নিশা মরে গুমরিয়া। এনলাইটেন্ড নাগরিকরা জানতেই পারেনা গোমরানো নির্বাক সেই আউটসাইডকে। আলোকপ্রাপ্ত নাগরিকরা এই বাহিরের কোনো কাহিনী তখনই জানতে পারে যখন সেই অন্ধকার মহাদেশ ঘুরে আসে কোনো পর্যটক। বা, যখন সত্যিই যোগ্যতাবান কোনো বহিরাগতকে, কালো বা বাদামি বা হলুদ মানুষকে গ্রিনকার্ড দেওয়া হয় এনলাইটেন্ড সুধী সমাজের বাজারের পথে ঘোরার, মানে, প্রবেশ করার।

আউটসাইড থেকে কিছু মানুষ নয় ইনসাইডে প্রবেশাধিকার পেল, কিন্তু যারা পেলনা? তাদের কথা ফুকো কিছুই বললেন না। এবার এই প্রবেশাধিকার না-পাওয়া মানুষের কাহিনী বলার দায়িত্ব আমাদের। সেই প্রাকৃতদের, তৃতীয় বিশ্বের আমজনতার। যারা এনলাইটেনমেন্টের উজ্জ্বল জগতে প্রবেশাধিকার পায়নি। গ্রিনকার্ড তো দূরের কথা যাদের ভিসাও জোটেনি। এই নিষিদ্ধ মানুষের কণ্ঠস্বরকে লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব আমাদের। আমরা এই অন্ধকার নৈঃশব্দ্যের মধ্যে থেকে তাদের হারিয়ে যাওয়া আওয়াজ খুঁজে আনতে চাই। তাদের সেই হারিয়ে যাওয়া আওয়াজ আসলে তো হারিয়ে যায়না, এনলাইটেনমেন্টের প্রথম বিশ্বে, বা সেই প্রথম বিশ্বের ডিসকোর্সে, তার উপগ্রহের মত আমাদের তৃতীয় বিশ্বের এলিট ডিসকোর্সেও ভেসে আসে সেই আওয়াজ, পুরো ভলুমে না, আসে ট্রেস হিশেবে, পদচিহ্ন হয়ে, সিম্পটমের আকারে।

এই সিম্পটমের ধারণা আমরা পেয়েছি ফ্রয়েড ভায়া লাকাঁ থেকে। ফ্রয়েড সিম্পটমকে ভেবেছিলেন একটা কমপ্রোমাইজ ফর্মেশন বা আপস-ব্যবস্থা হিশেবে। অচেতন মনের আমোদ খুঁজে বেড়ানো যৌন প্রবণতাগুলো সচেতন মনে তৈরি করে একটা অপরাধবোধ। সচেতন মন এবার এই অপরাধবোধকে গোপন করার, অবরুদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যায়। তখন আনকনশাসের ওই ড্রাইভগুলোর মুখে মুখোশ পরানো হয়। এবার সিম্পটম এখানে আসে একটা যন্ত্রের আকারে। যে যন্ত্র দিয়ে ওই কুদর্শন আমোদ-প্রবণতাগুলোর চেহারা বদলে দেওয়া হয়, সভ্য সমাজে তাকে নিয়ে আসতে গিয়ে। সচেতন মন তাদের সঙ্গে টানাপোড়েনে যাতে একটা স্থিতাবস্থা পেতে পারে। ট্রাডিশনাল একজন হিন্দু বিধবা তার জীবনের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে তার যৌন প্রবণতা থেকে তো মুক্তি পাননি। কিন্তু সেইজন্যে তিনি নিজেকেই দোষী মনে করেন। আনকনশাস তখন পাকিয়ে তোলে তার কাচাকাচির বাতিক, শুচিবায়ুগ্রস্ততা। যা দিয়ে ওই নারী তার অপরাধবোধকে মোচন করে, নিজের অচেতন মনের জায়গায় নিজের শরীরকে বারবার শুদ্ধ করে।

ফ্রয়েডের এই সিম্পটম তাই অচেতন মনের আমোদের থেকে তৈরি হওয়া পাপবোধকে গোপন করে। লাকাঁর চিন্তায় সিম্পটমরা কিন্তু গোপন করেনা, উল্টে প্রকাশিত করে দেয় অবরুদ্ধ গোপনকে। নিউরোটিকের মনের মধ্যে গজিয়ে ওঠা আত্মরক্ষার কৌশল হিশেবে ফ্রয়েড সিম্পটমকে ভেবেছিলেন। লাকাঁ এবার প্রশ্ন করলেন, সিম্পটমকে বানিয়ে দিয়েও কেন ব্যক্তিসত্তা তার স্থির প্রশান্তিতে আসতে পারছে না? কেন সে নিউরোটিকই থাকছে? সঙ্কটটাকে বিকিরণ করে দেওয়ার পরে তো শান্তি আসার কথা নিউরোটিকের? কেন সিম্পটমের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বারবার? লাকাঁ এবার সিম্পটমকে দেখলেন একটা অবরুদ্ধ রিপ্রেসড দ্যোতকের জায়গায় একটা বদলি দ্যোতক হিশেবে। সমাজের নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ বেচারা

বিধবার ব্যক্তিসত্তা তার আদত সিগনিফায়ারকে, মানে যৌনতাকে, গোপন করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু গোপন যা তা তো গোপন থাকতে পারে না, তা ফিরে আসবেই, অন্য চেহারায়। ব্যক্তিসত্তা সেই অবরুদ্ধ দ্যোতকের জায়গায় ঠেলে দেবে একটা বদলি দ্যোতক। এ সাবস্টিটিউট সিগনিফায়ার ফর এ রিপ্রেসড সিগনিফায়ার। অব্যক্ত সেই 'আনসেইড'-এর ট্রেস হিশেবে এবার ভেসে উঠবে এই নতুন দ্যোতক। যা আসলে ওই অবরুদ্ধ দ্যোতককে প্রকাশিত করে দেবে জনসমক্ষে, শুধু একটা নতুন পরিবর্তিত চেহারায়।

আমরা কিন্তু আমাদের সিম্পটম-ভাবনায় লাকাঁর মূল মডেল থেকেও সরে এসেছি অনেকটা। আমরা তাকে প্রয়োগ করেছি কৌশলগত আত্মসচেতন সারবাদ বা স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম-এর জগতে। লাকাঁর তত্ত্বে যে এলাকাটা কখনো আসেইনি। আমাদের এক নম্বর সেকশনে আমরা এসেনশিয়ালিজম-এর এককেন্দ্রিক বন্ধনের শাসনের থেকে উত্তরআধুনিকতার মুক্তি-আকাঙ্খার কথা বলেছিলাম। কোনো হায়েরার্কি না-মানার, স্পষ্ট সাদা কালো দুই বিপরীত মেরুর ধারণা না-মানার, সময়ের সমগ্রের কোনো সর্বাঙ্গীণ ঐক্য না মানার উত্তরআধুনিক গতি অবশ্যই এসেনশিয়ালিজমের ছক-কাটা চৌখুকি কাটা বাস্তবতার মডেল থেকে একটা মুক্তি দেয়। পুরো কাঠামোটাকে খুলে ফেলে, ওপন করে দেয়। ঠিক অতিনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে যে সমস্যাটা তৈরি হয়। কতকগুলো ডিটারমিনেট বিয়িং-এর অতিনির্ণীত একটা ঐক্যকে ভাবুন। আগে একেশ্বর এসেন্সের আমলে আমরা এক এসেন্সকে বুঝে ফেলতাম, তাতেই অ্যাপিয়ারেন্স বোঝা হয়ে যেত, বা মার্ক্স-এর মডেলে এক অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবারকে জানলেই আমরা জেনে ফেলতাম পুরো পুঁজির বাস্তবতাকে। কারণ-টা জানলেই কার্য-কে জানা হয়ে যেত, যেহেতু কারণই কার্যকে নির্ণয় করে। কিন্তু অতিনির্ণীত এই সমগ্রে সবাই সবাইকে নির্ণয় ও নির্মাণ করে, তাই কোনো আলাদা আলাদা কারণ বা কার্য-ই নেই আর। কিন্তু এসেনশিয়ালিস্ট ঘননিবদ্ধ সমগ্রকে এই উত্তরআধুনিক অতিনির্ণয়ে খুলে ফেলায় একটা সঙ্কট-ও তৈরি হল। এবার কোনো ডিটারমিনেট বিয়িং-কে বুঝতে হলে অন্য সমস্ত ডিটারমিনেট বিয়িং-কে বুঝতে হবে, একত্রে, কোনো আগে পরে নেই আর। মানে বোঝাটা এক কথায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। আর বোঝা থেকে যে ক্রিয়ায় পৌঁছই আমরা সেই ক্রিয়াগুলোও অসম্ভব হয়ে পড়ল।

এই বোঝার এবং ক্রিয়ার তলে, এপিস্টেমলজিকাল এবং অন্টলজিকাল প্লেনে, অসম্ভাব্যতাটাকে দূর করার জন্যে আমাদের ওই ওপনিং-এর সঙ্গে এবার একটা ক্লোজার-ও দরকার। বহুমুখী বিচিত্রমুখী এই বাস্তবতাকে খোলা যেমন হল, তাকে বন্ধ করার একটা উপায় দরকার। এই উপায়টাই দেয় স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম বা কৌশলগত সারবাদ। এই তত্ত্বটা এনেছিলেন রেজনিক উল্ফ। এই স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজ-এর সঙ্গে আবহমান আদত এসেনশিয়ালিজম-এর পার্থক্যটা এইখানে যে এই এসেনশিয়ালিজম নিজেই জানে যে সে একটা এসেনশিয়ালিজম। তাই এটাও জানে সে একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর ফসল, একটা নির্দিষ্ট এসেন্স ধারণার ফসল। আর একটা দৃষ্টিভঙ্গী আর একটা জায়গাকে এসেন্স বলে মনে করবে। তাই তার বোঝার জায়গাটাও আলাদা হবে। অর্থাৎ, বাধ্যতামূলক ভাবেই এখানে একটা সত্যের বহুবচনতা চলে এল, কারণ, প্রত্যেকেই তো এক এক ধরণের এসেন্স থেকে জাত এক একটা দৃষ্টিভঙ্গীর ফসল। এই আত্মসচেতন স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম নিজেই জানে যে তার সত্য একটা বিশেষ এসেন্স থেকে জাত, তাই তার এই সত্যের শুধু যে একটা সীমা থাকতে পারে তাই নয়, একটা সীমা থাকবেই, যার বাইরে এই সত্য দিয়ে বাস্তবতাকে আর বোঝা যাবেনা।

অর্থাৎ, স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম তৈরি হয় একটা উর্বর সমন্বয় থেকে, সমন্বয়টা আধুনিকতা আর উত্তরআধুনিকতার। আধুনিকতার পুঁজিসমাজের দর্শন রিজন, এনলাইটেনমেন্ট রিজন, যা গড়ে ওঠে একটা এসেন্সের চারপাশে। একটা আঁটসাঁট গাঁথুনির কাঠামো। আর কাঠামো মানেই হায়েরার্কি। উত্তরআধুনিকতা সেই হায়েরার্কিগুলোকে ভেঙে কাঠামোটাকে খুলে দেয়। এই দুটো গতির মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটায় স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম। এবং তত্ত্ব করার জায়গা বার করে দেয় তাত্ত্বিককে। এবং উত্তরআধুনিকতার সীমাহীন উন্মুক্ততা যে অসম্ভাব্যতা এনে দিয়েছিল কোনো কথা বলার বিষয়েই, সেটাকে দূর করে। একটা সদা-উন্মুক্ত অতিনির্ণীত কাঠামোতে যখন আমরা কৌশল হিশেবে স্ট্র্যাটেজি হিশেবে একটা ডিসকার্সিভ ক্লোজার ঘটাই তখনই স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম তৈরি হয়। আর, ক্লোজার ঘটাচ্ছি বা একটা জায়গায়

তাকে আটকে দিচ্ছি মানে, একদম সংজ্ঞাগত ভাবে তার একটা আউটসাইড থাকতে বাধ্য। একটা বাহির সবসময়েই রয়ে যাবে একটা স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিস্ট কাঠামোর। যেখানে তাকে আর পৌঁছতে দেবেনা তার কৌশলগত এসেন্সের বাধ্যতা।

এই আউটসাইড যাকে তৈরি করল বা খোলা ছেড়ে দিল স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম, তা কিন্তু লাকাঁর অর্থে আউটসাইড নয়। লাকাঁর মডেলে যাকে আমরা আউটসাইড বলে ভাবতে পারি, লাকাঁ যার নাম দিলেন 'রিয়াল', তা শুধু ওই কাঠামোর না, তত্ত্বের মননের চিন্তার আউটসাইড, অপ্রতিরোধ্য একটা বাহির, দি আনসেইড, সেই অকথিত এলাকা যাকে শুধু বুঝতে পারা যায় সিম্পটম দিয়ে। যখন সিম্পটম দিয়ে সেই অকথিত-র ছাপ এসে পড়ে কথিত চিন্তার ভুবনে, তত্ত্বের জগতে, সমালোচনা তাত্ত্বিকের মননে, গোটা মনোভূমি জুড়ে। এটা অপ্রতিরোধ্য ভাবেই বাহির, একে কখনোই কথিত চিন্তার তত্ত্বের জগতের অন্দরে নিয়ে আসা সম্ভব না। কিন্তু আমাদের এই তাত্ত্বিক কাঠামোর ক্ষেত্রে, ঠিক এর উল্টোটা। যদিও সেই আউটসাইড পাওয়ারের গেজের, প্রহরার, প্যান-অপ্টিকনের বাইরে, ক্ষমতার সব রকম শাসনের বাইরে, কিন্তু তার মানেই সেটা ক্রিটিকাল থিয়োরির, সমালোচনা তত্ত্বের আওতার বাইরে তা একেবারেই নয়। এই আউটসাইডকে প্রবলেমেটাইজ করা যায়, একে নিয়ে কাজ করা যায়, তাত্ত্বীকরণ করা যায়, তত্ত্ব দিয়ে এর খুঁটিনাটি জটিলতাকে ধরা যায়, যা লাকাঁর তত্ত্বে করা যায়না। এই আউটসাইডকেই আমরা ডাকি 'মার্জিন অফ মার্জিন' বলে, গোঁয়াড় একগুঁয়ে একটা ভূমি যা পাওয়ারের আওতায় আসতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক।

মার্জিন অফ মার্জিন নামের এই ভূমির তাত্ত্বিক মাপজোকের ক্ষেত্রে নিটশের জিনিলজি অফ মরালস একটা গুরুত্বপূর্ণ পূর্বসূরী। মার্জিন অফ মার্জিন নিয়ে আজকের যে কোনো তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের পূর্বপুরুষ। নিটশের এই মডেল দাস-কে বোঝে একটা ঋণাত্মক রকমে। মানে ধনাত্মক বলতে যদি আমরা প্রভুর দৃষ্টিকে বুঝি, তার ঠিক বিপরীত কোণ থেকে নির্মিত হয় দাস-এর দৃষ্টি। নিজের থেকে যা কিছুই বলেনা, শুধু প্রভুর দৃষ্টি যা বলে তার বিপরীত কথা বলে। সে নিজে কী, বা কী সে চায়, তা দাস জানেনা, সে শুধু জানে প্রভু মানে ইভিল (অমঙ্গল), আর গুড (ভালো) হল তাই যা এই অমঙ্গল-এর বিপরীত। তাই নিটশের এই ঋণাত্মক রকমে সংজ্ঞায়িত দাস হল প্রতিশোধপরায়ণ। যা কিছু ইভিল মানে প্রভু-উপম তাকে সে ভেঙে ফেলতে চায়। কিন্তু, এর বিপরীতে, প্রভু কিন্তু ধনাত্মক। এই অর্থে যে, সে নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত। সে নিজে কী, বা কী সে চায়, তা সে জানে। সে গুড বলতে বোঝে নিজেকে। আর, এই প্রভুর দৃষ্টিতে, দাস হল তার উল্টো তাই ব্যাড (খারাপ), কিন্তু তাই বলে সে ইভিল নয়। তাই প্রভু দাসকে ভুলে যেতে পারে অনায়াসেই, আত্মবিশ্বাসী প্রভু তাই দাস-এর প্রতি ফরগেটফুল বিস্মৃতিপরায়ণ হতে পারে, দাস যা পারেনা। প্রভুকে সে তার হৃদয়ে অহর্নিশি বহন করে বেড়ায়, ঘৃণায় প্রতিশোধে। খেয়াল করুন, ফরগেটফুলনেস বা বিস্মৃতিপরায়ণতা মানে সাপ্রেশন নয়, অবরুদ্ধ করা নয়। সাপ্রেশন মানে জোর করে বিস্মৃতির গহ্বরে ডুবিয়ে দেওয়া, আর ফরগেটফুল হওয়া মানে কোনো কিছুর আপনা থেকে স্মৃতির বাইরে চলে যাওয়া। সময় থেকে সময়ে আপনা থেকেই দাস প্রভুর স্মৃতির বাইরে চলে যায়। তাকে জোর করে ভুলতে হয়না। কিন্তু তার মানেই তো এই যে, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও, অস্থায়ী ভাবে হলেও, প্রভু সাময়িক ভাবে নিজেকে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কের থেকে বিযুক্ত করে নিতে পারছে। দাসকে দাসের জগতকে সে ভুলে থাকতে পারছে। নিটশের ক্ষমতা সংক্রান্ত এই ডিসকোর্স-এর এটা সবচেয়ে বড় ইন্টারেস্ট-এর জায়গা। এই পাওয়ার ডিসকোর্স একই সঙ্গে একটা তাত্ত্বিক ভূমিকে খুলে দিচ্ছে যেখানে পাওয়ার রিলেশনগুলো আর কাজ করছে না। একটা ভূমি যেখানে পাওয়ার রিলেশনগুলো আর নেই। নিটশে অবশ্যই এই জায়গাটা নিয়ে খুব বেশি এগোন-নি, যা আমরা আমাদের তত্ত্বে করেছি।

আজকের ফুকো প্রমুখ প্রচলিত পাওয়ার ডিসকোর্স বা ক্ষমতা সংক্রান্ত আলোচনা এমন কোনো ক্ষুদ্রাকৃতি মুক্তাঞ্চলের ধারণা মেনে নিতে নারাজ। আগেই বলেছি, এই তত্ত্বগুলোয় পাওয়ার মানেই সর্বব্যাপী সর্বত্রগামী এবং নিরবচ্ছিন্ন। সেই অটুট ধারাবাহিকতায় কোনো খামতি কোনো ছেদ মানতে অরাজি তারা। কেউ বলতেই পারেন, প্রহরা গেজ বা প্যান-অপ্টিকনের ধারণাটাকে নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করেছেন ফুকো। ধারণাটা শুরু হয়েছিল বেন্থামের সেই প্যান-অপ্টিকন থেকে — কেন্দ্রীয় জায়গায় একটা মিনার যার থেকে

জেলখানার সমস্ত বন্দীদের সেলে একসাথে নজর রাখা যাবে। ফুকো দেখিয়েছিলেন এই প্রহরা বা গেজ একটা উত্তরশিল্পসমাজের, পোস্টইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটির কেমন অন্তঃস্থ হয়ে গেছে। কেমন করে আধুনিক নবজাগরণোত্তর শিল্পসমাজের নাগরিকেরা প্রত্যেকে তাদের নিজের নিজের সামাজিক চেতনাতেও একখানা করে প্যান-অপ্টিকন নিয়ে ঘুরছে সেটা আমাদের দেখিয়েছিলেন ফুকো, তার ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ-এ। দেখিয়েছিলেন, কিভাবে, ম্যাডনেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশনের সেই গ্রেট কনফাইনমেন্ট, বৃহৎ বন্দীত্ব, ছড়িয়ে যায় গোটা সমাজে। হাসপাতাল পাগলাগারদ স্কুল বিশ্ববিদ্যালয় কারখানা — সমস্ত জায়গায়। চিকণ কুচো কুচো প্রভুরা — ডাক্তার, মনোসমীক্ষক, প্রফেসর, নানা অবয়বে — দাসকে সদাসর্বদা অতন্দ্র প্রহরায় রেখে চলেছে। দাসের উপায় নেই প্রভুর সেই প্রহরা ছেড়ে পালানোর। প্রহরাটা চলতে চলতে একসময় দাসের শরীর ফুঁড়ে তার অন্তরের অন্তঃস্থল অব্দি পৌঁছে যায়, শুধু তার না, তার সেই মাইক্রোপ্রভুদেরও যায়, তাদের অস্তিত্বগুলোকেই বদলে ফেলে। প্রহরাটা অন্তঃস্থ হয়ে যায় সামাজিক মানুষের, দি গেজ ইজ ইন্টিরিওরাইজড।

১১। জিনিলজি অফ মরালস

আমরা এরকম মনে করিনা যে, ফুকো শুধু পাওয়ারকেই বুঝেছেন, সবকিছুকেই নামিয়ে এনেছেন নিছক একটা পাওয়ার রিলেশনের খুঁটিনাটিতে। ফুকো তা যে করতে চেয়েছেন তাও নয়। পাওয়ার রিলেশন-কে ফুকো একটা আপেক্ষিক স্বাধীনতা দিয়েছেন, একটা রিলেটিভ অটোনমি, তারপর সেই পাওয়ার রিলেশনের মাপকাঠিতে এমন অনেক কিছুকে খুঁজে দিয়েছেন যার আদত অর্থ আমাদের নজর এড়িয়ে যেত। কিন্তু তাই বলে যে ফুকো সত্যিই পাওয়ারকে আর একটা ঈশ্বর করে দিতে চেয়েছেন তা নয়। পাওয়ারকে তিনি ওমনিসিয়েন্ট বা ওমনিপোটেন্ট, সর্বভূতে বিরাজমান এবং সর্বশক্তিমান বলেও দাবি করেননি। এই যে প্যান-অপ্টিকন সহ বিভিন্ন ধরনের প্রহরা পাওয়ারকে অষ্টপ্রহর চালিয়ে যেতে হচ্ছে এটাই তো প্রমাণ করে যে, পাওয়ারের কিছু সীমা আছে, যার বাইরেটাকে পাওয়ার নিজেই ভয় পায়। ফুকো পাওয়ারকে বুঝতে চেয়েছেন তার কর্মপদ্ধতির নিরিখে। কিভাবে পাওয়ার কাজ করে, তার অস্তিত্বের শর্তগুলো কী কী, সীমাগুলো কোথায় কোথায়, এবং কীভাবে পাওয়ার বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে কোন কোন ধরনের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে — এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজেছেন ফুকো। এই অব্দি আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সমস্যাটা আসে এইখানে যে ফুকো কিন্তু পাওয়ারের সীমাগুলোকে বিবৃত করেননি। সেই অবস্থাগুলো কী যখন প্রভুর ওই প্রহরা অক্ষম হয়ে পড়ে — সেই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেননি। নিটশের জিনিলজি অফ মরালস-কে আমরা নিয়ে আসি ঠিক এই জায়গাটাতেই।

নিটশের জিনিলজি অফ মরালস দিয়ে আমরা খুঁজে বার করার চেষ্টা করি ফুকোর তত্ত্বে সেইসব নিঃশব্দ অন্ধকার এলাকাগুলোকে, যারা একই সঙ্গে প্রভুর ক্ষমতার জগতেরও অন্ধকার নৈঃশব্দ্য — প্রভুর প্রহরার অ্যান্টেনা যেখানে আর কাজ করেনা। পাওয়ারের পৃথিবীর দৃষ্টির সেইসব ডার্ক স্পট যেখানে প্যান-অপ্টিকন আর কাজ করেনা। নিটশের কাঠামোয় প্রভু নিজেকে গুড বা ভালো মনে করে, আমরা আগেই বলেছি। আর দাসকে মনে করে ব্যাড বা খারাপ। আর তাই, খারাপ জিনিষ কে আর মনে রাখতে যায়, প্রভু দাসকে ভুলে যায় অনায়াসেই। প্রভু প্রতিষ্ঠিত করে কিছু নৈতিক মূল্যবোধকে, সেইসব ভালো মূল্যবোধ যা প্রভুকে প্রভু করেছে। বীরত্ব, গতিশীলতা, প্রতিযোগিতা, লড়াকুআনা। আর এর বিপরীতে দাসের জগতের দাসত্বময় মূল্যবোধগুলোকে প্রভু খারাপ মনে করে, ব্যাড। সেইসব মূল্যবোধ যা দাসকে দাস করেছে। ভয়, কাপুরুষতা, অনড় স্থবিরতা। আর তাই সেইসমস্ত সত্তা যা দাসের এই দাসীয় মূল্যবোধগুলোকে হাজির করে তারা সবাই এককথায়, ওই মূল্যবোধগুলোর মতই, ব্যাড। যাদের পরিহার করে প্রভু, এবং বেমালুম বিস্মৃত হয়। কিন্তু, মন দিয়ে পড়ুন এই বাক্যটা, প্রভুর এই বিস্মরণের অঞ্চল তো একই সঙ্গে তার অজানা অঞ্চল-ও। প্রভু তো জানেনা, কেমন করে ভয় পায়, কাপুরুষতার কাঠামোটা ঠিক কী? আর যে এলাকা যে প্রভু চেনেইনা তাকে সে বদলাবে কী করে? তাই প্রভু হিংসার সঙ্গে লড়াই করতে পারে, কিন্তু অহিংসার সঙ্গে পারেনা। এই

এলাকাটারই আমরা নাম দিই 'মার্জিন অফ মার্জিন', প্রভুর প্রহরার ওপারে সেই অজানার অঞ্চল, বিস্মৃতির এলাকা।

এবার আসে স্বাধীনতার প্রশ্ন। এই বিস্মৃতির এলাকাটা কি দাসের স্বাধীন অঞ্চল? যদি আমরা ঋণাত্মক রকমে স্বাধীনতাকে বুঝতে রাজি থাকি, মানে, প্রভুর না-থাকাটাকেই যদি আমরা স্বাধীনতা বলে আখ্যা দিতে রাজি থাকি, তাহলে এটা অবশ্যই স্বাধীনতা। সেই অর্থে একটা স্বাধীনতা বিচরণ করে এইখানে, প্রভুর বিস্মৃতির অঞ্চল এই মার্জিন অফ মার্জিনে। প্রভু এখানে অনুপস্থিত। তাই, দাসের স্বাধীনতার এটা একটা পূর্বশর্ত যে প্রভুর মূল্যবোধগুলোকে সে উল্টে নেবে, ইনভার্ট করে নেবে। প্রভু যা গুড মনে করে তা হবে দাসের কাছে ব্যাড। প্রভু দাসকে মনে করে আলসে এবং ভিতু। তাই দাসকে এবার একটা জগত নির্মাণ করতে হবে এই অলস মানুষের অবয়বে, একজন ভিতু মানুষের অবয়বে। একটা সন্ত্রাসবাদী বা বিপ্লবী আন্দোলনে প্রভু হস্তক্ষেপ করতে পারে, প্রভুর কৌতূহল জেগে উঠতে পারে, সেই আন্দোলনকে প্রভু ভেঙে দিতে পারে। কিন্তু অহিংসার অসহযোগের সামনে, অনশনের সামনে কী করার সে খুঁজে পাবেনা। বা শান্তি আন্দোলনকে সে শায়েস্তা করবে কী ভাবে? প্রভু তো অহিংসার শান্তি কাকে বলে তা জানেই না। তাই, দুটো আলাদা প্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গী এখানে হতে পারে। এক, প্রভু দাসকে দেখে ব্যাড — অলস বা কাপুরুষ। দাস এবার আপত্তি করে এইভাবে দেখাটাকে, এবং জানায় যে এটা তাকে ভুলভাবে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। দাসকে ছোট করা হচ্ছে। তাই, দাস এবার প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে সে-ও গুড, মানে সাহসী, কর্মঠ, বীর, আক্রমণপরায়ণ। অর্থাৎ, সে নিজেকে এবার প্রভুর অবয়বে হাজির করার চেষ্টা করে, প্রভুর মডেলে। আর দুই, অন্য দৃষ্টিভঙ্গীটা সরাসরি অবহেলা করে প্রভুর ওই মতামত, প্রভুর ওই গুড হওয়ার ধারণা। এবং সে স্বেচ্ছায় ব্যাড হয়, প্রভু যাকে ব্যাড বলে মনে করে।

একটা ব্যাড মানুষের উদাহরণ নেওয়া যাক, আধুনিক পৃথিবী যাকে খুব নিচু চোখে দেখে সেইরকম একজন মানুষ হল সতী, মানে সতীদাহে যাকে দাহ করা হত। যে তার মৃত স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় দাহ হয়ে যেত। সামনে থাকত একঝাঁক মানুষ, ঢোল বাজাচ্ছে, উৎসব করছে, জয়ধবনি করছে, তারা একটা বৃহৎ পুণ্য ঘটে যেতে দেখছে চোখের সামনে। এখানে কোনো সন্দেহ নেই যে আধুনিক উত্তরআধুনিক সমস্ত মতামতেই সতী অত্যন্ত ব্যাড বলে গন্য হবে। ব্রিটিশের ভারতজয়ের পর তাদের প্রথম কাজগুলোর একটা ছিল এই ব্যাড সতীদাহপ্রথার অবলোপ। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ যে আইনী ব্যবস্থা নিয়েছিল এর জন্যে সেই তখনো ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবাসী অভিনন্দন জানিয়েছিল এবং এখনো জানায়। কিন্তু সতীদাহ প্রথা রদ করার আর একটা বৃহত্তর তাৎপর্য আছে যা প্রায়ই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। যখনই আমরা সতীদাহ প্রথাকে অবলোপ করছি তখনই, একই সঙ্গে, আমরা আত্মহত্যার অধিকারকে রদ করে দিচ্ছি। সতীদাহ ঘটে একটা বিরাট জনতার সামনে। সর্বসমক্ষে সবাইকে সাক্ষী রেখে এই আত্মহত্যা করা হয়। স্বেচ্ছায়, একটা কারণের জন্য। আইনের চোখে এই কাজটা অনৈতিক, ইমমরাল, জনতাকে সাক্ষী রেখে এই আত্মহত্যা। কিন্তু এই অনৈতিক ক্রিয়াটার একটা বৃহত্তর তাৎপর্য আছে।

অনশন ধর্মঘটে, যা থেকে অনশনকারীর মৃত্যু হতেই পারে, বা, অনেক লোকের সামনে নিজের গায়ে আগুন দেওয়া — এগুলো সবই এক একটা অস্ত্র যা দিয়ে অহিংস আন্দোলন একটা চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছতে চেয়েছে। একজন প্রতিবাদ স্বরূপ নিজেকে হত্যা করছে, সবাইয়ের সামনে, আর এইভাবে সবাইকে সেই আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করছে। ভারতে, স্বাধীনতা আন্দোলনে, মন্ডল কমিশন রায়ের বিরুদ্ধে, ভিয়েতনামে, আরো নানা জায়গায় এই পদ্ধতি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। গত এগারই সেপ্টেম্বর মহম্মদ আটা এবং তার সঙ্গীরা ছিল এরই আর একটা উদাহরণ। কমিউনিস্ট বা অন্যান্য সহিংস বিপ্লববাদীরা এই আত্মহত্যার পন্থায় আপত্তি করেন। যদি হত্যা করতেই হয় তো নিজেকে কেন, শত্রুকে মারো। এই গোটা জায়গাটাই তাদের নজর এড়িয়ে যায় যে এই অহিংস পন্থা তার নিজের ভিতরেই নিজের আদারকে বহন করে — চূড়ান্ততম হিংসার সম্ভাবনাটাকে। ঠিক এইখান থেকে তৈরি হয় সন্ত্রাসবাদী সুইসাইড স্কোয়াডগুলোর অপ্রতিরোধ্যতা। যে নির্দ্বিধায় নিজেকে হত্যা করতে পারে, সে তো চোখের পলক না-ফেলেই অন্যের মৃত্যুর-ও কারণ হতে পারে।

যে ভিয়েতকং-রা বুকে মাইন বেঁধে আমেরিকান ট্যাঙ্কের সামনে ঝাঁপাত, বা রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল যে ছোট্টখাট্ট চেহারার মেয়েটি, বা এগারই সেপ্টেম্বর আমেরিকার উদ্ধত লিঙ্গ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে এরোপ্লেন ফেলে যারা পৃথিবীর বাবা আমেরিকাকে ক্যাস্ট্রেশন ফিয়ার বা লিঙ্গচ্ছেদভীতি ফেরত দিয়েছিল, যে ভীতি বাবা থেকে বাচ্চা পায় তার শৈশবে, তারা সবাই সেই স্বীকৃত বীরত্বের ধারণার নিরিখে ভিতু, মিক। কারণ, তারা তাদের শত্রুকে আক্রমণ না করে করেছিল নিজেকে। নিজের মৃত্যুতে ভয় পায়নি বলে তার সঙ্গে আরো অনেক মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। যে নিজে মরতে রাজি তাকে তো আটকানো যায়না। এগারই সেপ্টেম্বর সিএনএন-এ বড় বড় লাল অক্ষরে ঘোষিত 'আমেরিকা আন্ডার অ্যাটাক'-এ মার্কিন যুদ্ধসচিবের পরপরই এলেন একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, যিনি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের বাড়িটা যথেষ্ট মজবুত ছিল কিনা সেই বিষয়ে বলবেন। তিনি এসে বললেন সবচেয়ে দামি কথাটা। তিনি জানালেন পৃথিবীর কোনো বিল্ডিং এই ধরনের আক্রমণকে মাথায় রেখে তৈরি হতে পারে না। মহম্মদ আতাদের আক্রমণটাকে তিনি নাম দিলেন 'লো-টেক হাই-কনসেপ্ট অ্যাটাক', ছোট-প্রকৌশল বড়-চিন্তার আক্রমণ। সত্যিই এর চেয়ে ভালো নাম আর হতে পারেনা। প্রকৌশলে ক্ষমতায় শারীরিক বীরত্বে আমি জানি আমি আমার ক্ষমতা খুব কম, দ্বৈরথে যাওয়ার শক্তি আমার নেই, তাই এই কাপুরুষ যুদ্ধটার কনসেপ্টটা এমন একটা জায়গায় যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রকৌশলকে অতিক্রম করে যায়, আমেরিকার শক্তিকে অতিক্রম করে যায়। তাই ভিতু কাপুরুষ থেকে সাবধান, তার ভয় তার কাপুরুষতা যে কোনো সময়ে এমন একটা যুদ্ধাস্ত্রে পরিণত হয়ে যেতে পারে যার সম্মুখীন হতে এই বীরত্বের পৃথিবী শেখেনি।

রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর লেখায় প্রথম যার ঘোষণা ছিল, "ওহ, ইস্ট ইজ ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট, অ্যান্ড নেভার দি টোয়াইন শ্যাল মিট', আরো অনেকেই যা জানত, কিন্তু স্পষ্টভাবে বলে উঠতে পারেনি, উনিশশো আটাত্তরে এডওয়ার্ড সইদের ওরিয়েন্টালিজম প্রকাশের পর থেকে সেই ইশুটা সামনে চলে এল। এবং এবার আর কাব্যিক প্রকাশে নয়, একদম তত্ত্বের জগতে। পশ্চিম আর পূর্বের দূরত্ব এবং পার্থক্য। এবং এডওয়ার্ড সইদের লেখা থেকে সামনে চলে এল মানে, পশ্চিমের চোখের সামনে চলে এল। ব্যাপারটা দাঁড়াল অনেকটা এইরকম, ওরা (মানে পশ্চিম) আমাদের (মানে পূর্ব, ওরিয়েন্ট) ভুল ভাবে চিত্রিত করে, আমাদের ছোট করে, মিসরিপ্রেজেন্ট করে, ইনফিরিওরাইজ করে। তাহলে প্রশ্নটা দাঁড়াল এই, এবার আমরা কি আমাদের 'ঠিক' ভাবে চিত্রিত করতে পারিনা? তার সঙ্গে সঙ্গেই এল, আমরা কিভাবে আমাদের রিপ্রেজেন্ট করব? (এই 'রিপ্রেজেন্ট করা' শব্দবন্ধটায় একই সঙ্গে দুটো অর্থ রয়ে যাচ্ছে, 'চিত্রিত করা', 'প্রতিনিধিত্ব করা'। পূর্বের হয়ে লেখা তো ওয়েস্টের ডিসকোর্সের সামনে পূর্বের প্রতিনিধিত্ব-ও করে।) এই প্রশ্নগুলো আটাত্তরের পর থেকে ক্রমে বেমক্কা পপুলার হয়েছে তাত্ত্বিক জগতে, লেখালেখির জগতে। কিন্তু এখানে একটা বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া আছে, কতটা জোর পড়ার কথা প্রশ্নগুলোয়, তার লেভেলে একটা গন্ডগোল আছে। পূর্বের হয়ে এই নিজস্ব পরিচিতি বা আইডেন্টিটি খোঁজার এই প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে গোড়া থেকেই একটা তাত্ত্বিক গ্যাঁড়াকল রয়ে যাচ্ছে। ওরিয়েন্টালিজম বা ওরিয়েন্টবাদের বিরোধিতা করে যারা নতুন করে আইডেন্টিটি খুঁজতে চাইছেন সেই তাত্ত্বিক সমালোচক-ও পশ্চিমের সঙ্গে একই মূল্যবোধ-কাঠামোর শরিক। এবং দুনিয়ার ডিসকোর্স জুড়ে শাসক এই মূল্যবোধ-কাঠামোকে গোড়া থেকেই মেনে নিচ্ছেন এই সমালোচনা তাত্ত্বিক-ও। মেনে নেওয়ার পর তিনি বদলি এবং বিকল্প আর একটা রিপ্রেজেন্টেশনের (চিত্রণের, প্রতিনিধিত্বের) প্রয়োজনের কথা বলছেন। তার মানে, শেষ অব্দি, পুরো ব্যায়ামটা হয়ে দাঁড়ায় শাসক নৈতিক মূল্যবোধগুলোর জন্যে একটা ভিন্ন আকার ও অবয়ব খুঁজে দেওয়া, ফর্ম খুঁজে দেওয়া, যা দিয়ে ওই মূল্যবোধগুলো একটা নয়া চেহারা নিয়ে ওরিয়েন্টে হাজির হতে পারে।

আমরা এখানে প্রস্তাব করছি এই শাসক মূল্যবোধগুলোর একটা ইনভার্শনের, উল্টে দেওয়ার। যাতে আমরা এই ফাঁদ থেকে বেরোতে পারি। একজন মানুষ যদি ওই মূল্যবোধগুলোর শরিক নাও হয়, সে এবার স্ট্র্যাটেজি হিশেবে, কৌশল হিশেবে তাদের শরিক হতে পারে। ভিতুদের কাপুরুষদের কথা বলতে দাও। পৃথিবীটা ইতিমধ্যেই অতিনির্ণীত ঐক্য হয়ে বসে আছে, সেখানে ঐতিহ্য আর আধুনিকতা, ট্র্যাডিশন আর মডার্নিজম দুজনেই দুজনকে নির্ণয় ও নির্মাণ করছে। সেই পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে নিজের আইডেন্টিটি

পুনরাবিষ্কারের চেষ্টাটা গোড়া থেকেই অর্থহীন। আমরা যা পারি তা হল প্রভুর ওই হেজেমনিটাকে জেরা করা, প্রশ্ন করা, তার বিরুদ্ধ যুক্তিগুলোকে নিয়ে আসা। যতক্ষণ আমাদের এই 'আমরা' ধারণাটা থাকবে ঋণাত্মকভাবে সংজ্ঞায়িত, নেগেটিভলি ডিফাইন্ড, মানে, নিজেদের বুঝছি পশ্চিমের বিপরীত করে, পশ্চিমকে উল্টে, ততক্ষণ নিজেদের পুনরাবিষ্কার করার চেষ্টাটা আসলে আরো আরো বেশি করে আমাদের স্থানান্তরিত করে দেবে, ডিসপ্লেস করে দেবে। পশ্চিমের মডেলে, পশ্চিমের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে পূর্বকে নতুন করে খুঁজে পেতে গিয়ে আমরা পূর্বকে আরো আরো নড়িয়ে দেব, আবার নতুন করে গড়ে তুলব, ঠিক 'ওরিয়েন্ট' এর মতই, 'পূর্ব' নামের আর একটা পশ্চিমি কাঠামো। এবং পুর্বের নিজের ভিতরেই যে অজস্র অসমস্বত্ত্ব বহুমুখী হেটেরোজেনাস পরিচিতি রয়েছে তাদের সবাইকে নামহীন অস্তিত্বহীন করে দেব। নড়িয়ে দেব তৃতীয় বিশ্বকে। আর এক ভাবে বললে, সাদা ওরিয়েন্টালিজম-এর জায়গায় আমরা বসাব বসাব বাদামি ওরিয়েন্টবাদ। সাদা সাহেবদের হাতে পরিচিতিনিধনের জায়গায় এবার বাদামি পাতিসাহেবদের হাতে অনস্তিত্ত্ব হওয়া।

এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই যে পশ্চিমের কিছু ভালগার ওরিয়েন্টবাদী মিলে তাদের প্রাণের খেয়ালে পাকিয়ে তুলেছিলেন ওরিয়েন্টালিজম নামক তামাশা। ওরিয়েন্টালিজম নির্মিত হওয়ার সুস্পষ্ট একটা ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রয়োজনের জায়গা ছিল। ট্রাডিশন যেখানে মডার্নিজমের সঙ্গে ওভারডিটারমিনেশনে আছে সেইরকম একটা পৃথিবীতে ডিসকোর্স নির্মাণের পদ্ধতির ইতিহাসের যুক্তি বেয়েই এসে পৌঁছেছিল ওরিয়েন্টালিজম-এর অনিবার্যতা। ঐতিহ্য আর আধুনিকতার অতিনির্ণীত ডিসকোর্সকে ওরিয়েন্টালিজম-এ এসে পৌঁছতেই হবে। পশ্চিমের কিছু পেঁজো বুদ্ধিজীবীই এই ধ্যাষ্টামোর শিকার, আমরা বাপু এর থেকে মুক্ত — এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই। অতিনির্ণীত এই ডিসকোর্সের মধ্যে উপ্ত পশ্চিমের মূল্যবোধ কাঠামোর মধ্যেই রয়েছে ওরিয়েন্টবাদের শিকড়। এখানে প্রয়োজনীয় হল ওই শাসক নৈতিক মূল্যবোধগুলোকে ওল্টানো, ইনভার্ট করা। যাতে আমরা এমন একটা নৈতিকতার আবহ তৈরি করতে পারি যেখানে দেখাতে পারব কিভাবে আপাত কাপুরুষতার অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা প্রতিরোধের ব্যাকরণ লুকিয়ে থাকতে পারে। এই উলটপুরান কিন্তু দাসের জাগতিক জৈবনিক অবস্থার কোনো গুণগত বদল ঘটায় না, বদল ঘটায় এই অবস্থাকে দেখার তার অবস্থানের। দাস দাসই থাকে। দাস যদি আরোহনের চেষ্টা করে, তার সামাজিক অবস্থান বদলের চেষ্টা করে, বড়জোর সে যা হতে পারে তা হল প্রভু। কিন্তু প্রভু-দাস বাস্তবতাটা বদলায় না। এইখান থেকে আমরা শুরু করছি। এবার এই তত্ত্বকাঠামোর মধ্যে দাসের সম্ভাব্য সমস্ত কৌশলগুলোকে আমরা যাচাই করে দেখতে চাই।

প্রভুর নৈতিক মূল্যবোধের আবহটাকে যদি সত্যিই ওল্টানো যায় তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের একটা প্রতিরোধ তৈরি হয় যাকে প্রভু আর বুঝতে পারেনা। তার গুচ্ছ গুচ্ছ উচ্চ-প্রকৌশল আয়ুধ হাতে নিয়ে সে ক্যাবলা কার্তিকের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তার ডব্লুটিসির মহার্ঘ লিঙ্গ উৎপাটন করে তাকে খোজা করে দিয়ে গেল কয়েকটি খালি-হাত কাপুরুষ। প্রভুর প্রহরা এখানে ভেঙে পড়ে। শৈবাল আমেরিকা থেকে ফিরেছে ডিসেম্বরের গোড়ায়। এয়ারপোর্টে চেকিং-এর সময়ে প্রহরী এসে ওকে জানায়, আপনার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত তল্লাশি করা হবে, এটা সবাইকে করা হচ্ছে না, শুধুমাত্র কমপিউটার যাকে র‍্যানডমলি পছন্দ করছে তাকেই করা হচ্ছে। এবং, পরে দেখল শৈবাল, কী বিচিত্র সেই কমপিউটার, যা শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের মানে পাকিস্থান ভারত আর বাংলাদেশের লোকদেরই পছন্দ করছে, এবং এই জনগোষ্ঠীর একজনকেও অপছন্দ করছে না। কিন্তু এত প্রহরা এত গেজ এত প্যান-অপ্টিকন দিয়েও ওরা কী পারবে আটকাতে যদি আরো আরো এশিয়ান আতাক্যালানেরা দলে দলে মহম্মদ আতা হতে শুরু করে? সাহেবের মডেলে কাপুরুষ এই প্রতিরোধের সামনে এসে সাহেবের প্রহরা ভেঙে পড়ে।

এই একই জায়গা থেকে জেরা করা যায় দাসের জগতের পরিচিত বীরদের বাস্তবতা নিয়েও। (আমরা অন্যত্র এটা বিশদভাবে করেছি — কলোনি যায়নি মরে আজো, বইমেলা ২০০২, অনুষ্টুপ)। দাসের জগতে আমাদের জনপ্রিয় বিদ্রোহী বীরদের যদি আমরা একটু খুঁটিয়ে বিচার করি তো দেখতে পাব, তাদের অনেকেই আসলে প্রভুর ভাষায় প্রভুর জবানিতে চিৎকার করেছেন, হিজ মাস্টার্স ভয়েসে। এবং, যা, আর এক

জায়গায়, আর একটু উঁচুতে, রক্তমাংসের প্রভুর চেয়ে উপরে প্রভুর ডিসকোর্সের শাসনের তলে প্রভুর ক্ষমতার হেজেমনিকেই শক্তিশালীতর করেছে। কলোনির প্রতিরোধ কিভাবে সহায়তা হয়ে গিয়েছিল, রেজিস্টান্স বলে যা আমরা চিনেছিলাম তা আসলে কিভাবে একটা বৃহত্তর গোপন কোলাবোরেশন হয়ে উঠেছিল সেই আলোচনা আমরা আগেই করেছি। এটা তার জায়গা নয়। আর ঠিক এই একই মুদ্রায়, যা আমরা দাসের কাপুরুষতা এবং মাথা-নোয়ানো বলে দেখছি তার ভিতরেও আমরা একটা গভীরতর প্রতিরোধকে খুঁজে পেতে পারি। কিন্তু এই স্ব-আরোপিত অসম্মাণের মধ্যে দাস বাঁচবে কী নিয়ে? কোন দিকে তাকিয়ে? যারা সাহেবের মূল্যবোধ দিয়ে পৃথিবীকে দেখে অভ্যস্ত তাদের কাছে এটা একটা রহস্যই রয়ে যায়।

মার্জিন অফ মার্জিন সিরিজের প্রথম প্রবন্ধ ডিকন্সট্রাকশন ডিকলোনাইজেশন (৯৯, পুজো অনুষ্টুপ) লিখে আমরা সেই প্রতিরোধের রাজনীতিকে চিহ্নিত করেছিলাম, যা তত্ত্বের সংস্কৃতির ডিসকোর্সের তলে দাসের প্রতিরোধকে বহন করতে পারে। করে এসেছে মানুষের ইতিহাসে এতাবৎকাল। এবং প্রতিরোধ আবহমান। আমরা আমাদের এই প্রবন্ধগুলোয় সেই আলোচনাই করেছি, এবং এই প্রবন্ধগুলো যেখান থেকে তাদের বিষয় নিয়েছে সেই মার্জিন অফ মার্জিন : প্রোফাইল অফ অ্যান আনরিপেন্টান্ট পোস্টকলোনিয়াল কোলাবোরেটর' বইটাতেও যা আমরা বলেছি তাই এই দাসের চিন্তার রাজনীতি নিয়ে। উত্তরআধুনিকতা আমাদের চালু দাস-প্রভুর মডেলকে ভেঙে দিয়েছে। উত্তরঔপনিবেশিকতা আমাদের শেখাতে চেয়েছে এখন আর সেই দমন নিয়ন্ত্রণের বাস্তবতা নেই যা কলোনিতে ছিল। আমরা তৃতীয় বিশ্বে প্রতিটি মুহূর্তকে যাপিত হতে দেখি অনেক বেদনায় যন্ত্রণায় রক্তপাতে। অথচ সেই বেদনার কথা বলার, বেদনার অপনোদনের জন্য প্রতিরোধ নির্মাণের ভাষাটাই নেই হয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তিত বিশ্বের পরিবর্তিত বাস্তবতায়, অনস্বীকার্য ভাবেই উত্তরআধুনিক এই বাস্তবতায় পুরোনো তত্ত্বকাঠামো গুলো অকেজো হয়ে যাচ্ছে। পুরোনো তত্ত্বগুলো নেই হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি এই তৃতীয় বিশ্ব তার প্রাকৃত তার বেদনা তার প্রতিরোধ তার প্রতিরোধের তত্ত্বও নেই হয়ে যাবে। আসলে তো আমাদের মার্জিন অফ মার্জিন বইটার একটা নাম এটা হতেই পারত — নোটস টুওয়ার্ডস এ পোস্টমর্ডান থিয়োরি অফ চেঞ্জ। খেয়াল করুন, আমরা এটাকে কোনো পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব বলে দাবি করছিনা। আমরা শুধু এই গরঠিকানা বোধ ধারণা চিন্তাগুলোর একটা ঠিকানা একটা কাঠামো তৈরি করার চেষ্টা করছি। একটা উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক কাঠামো। এই তত্ত্ব তাই এক অর্থে সবসময়েই ত্রিশঙ্কু, ঝুলে আছে। শেষ কথা বলার অধিকার আমাদের তাত্ত্বিকদের নেই। কিন্তু গোড়ার কথাটুকুও বলার কেন বোঝার কানই নেই আমাদের চারপাশের বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবীর, অনেক মানুষের। সেই কানটাকে আমরা বানিয়ে তুলতে চাইছি। এই প্রবন্ধের সিরিজটা ঠিক তাই চায়।